দ্বিতীয় অধ্যায়

# নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারার অন্বেষণ

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারী সম্পর্কের বহুমুখী ধারার অন্বেষণ

ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস ও বড়গল্প বা নভেলেট মিলিয়ে মোট ৫৮টি রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর পুত্র অভিজিৎ মিত্রের সম্পাদনায় এবং আনন্দ পাবলিশার্সের সহায়তায় উপন্যাস সমগ্র-১ থেকে উপন্যাস সমগ্র-৫ -এ বিন্যস্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩৬টি উপন্যাস পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। বাকীটা অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। লেখক যেহেতু পেশাগত দিক দিয়ে পত্রিকা অফিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেহেতু পত্রিকার বিশেষ বিশেষ সংখ্যার, মূলত পুজো সংখ্যার তাগিদে স্বল্প সময়ের মধ্যে লেখা পাঠাতে হত বলে তাঁর বহু রচনা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। সেগুলিকে তিনি 'ক্ষুদ্র' উপন্যাস বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, যেগুলি তৎকালে বড় গল্প হিসাবে পরিচিত ছিল। এরকম অনেক রচনা লেখকের গল্পমালার বিভিন্ন খণ্ডে স্থান পেয়েছে। তবে তাঁর ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টি পাঠকমহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। কেবলমাত্র পাঠক মহলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার বেশ কয়েকটি রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, বেতারে পঠিত হয়েছে। এমনকি, কথাসাহিত্যের সমালোচকদের কলমেও যথাযথ মর্যাদা লাভ করেছে। আমার আলোচনার বিষয় – ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্কের ধারা যে কত বিচিত্র রূপে উন্মোচিত হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন প্লট গ্রহণ করে লেখক অত্যন্ত চেনা নর-নারীর সম্পর্কের গভীর গহন রহস্যের নানা দিককে বিভিন্ন উপন্যাসে উদ্ভাসিত করেছেন। তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত। আলোচ্য অধ্যায়ে এই বিষয়ের উপরে দৃষ্টি রেখে বলা যায় – উপন্যাস সমগ্র না হলেও জীবনের বেশিরভাগ অংশকেই তুলে আনে। সুতরাং সেখানে বহু মানুষের ভীড় যেমন থাকে তেমন ঐ মানুষগুলিকে ঘিরে নানা সম্পর্কের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেই সম্পর্কগুলির ধারাও বিভিন্ন বৈচিত্র্যের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। তার সম্পূর্ণটা অধ্যায়ের এই ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। নর-নারীর মূলত ভালোবাসার সম্পর্ক যেগুলি গতানুগতিকতাকে ছাপিয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে, যেগুলির সমীকরণ, গঠন কাঠামো ও পরিণতি পাঠক হৃদয়কে আলোড়িত করে, বিশেষত সেই সম্পর্কের স্বরূপকে এখানে তুলে ধরব। সেই সঙ্গে এই মূল সম্পর্কের ধারা

প্রতিষ্ঠিত করতে যে সকল গৌণ সম্পর্কের শাখা রচিত হয়েছে সেগুলিকেও ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এখানে বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার সাল অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করা হল –

ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল **'দ্বীপপুঞ্জ'** (১৯৪৭)। উপন্যাস জীবনের কথা বলে। জন্মলগ্ন থেকেই জীবদেহ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে কৈশোর-যৌবন জরার সীমানা ডিঙিয়ে চলে ঠিক তেমন পাশাপাশি জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে লব্ধ নানাবিধ সম্পর্ককে পাথেয় করেই মানব-জীবন এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকটি মানুষ আসলে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। রুচি, মানসিকতা, মতাদর্শ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। সেই সূত্র ধরেই সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদার ক্ষেত্রভূমিও পৃথক পৃথক। এক একজন মানুষ এক একটি সম্পর্ককে তথা ব্যক্তি মানুষকে ঘিরে আপন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূর্ণও হয়, আবার হয়তো বা বেশিরভাগ সময় অপূর্ণ-ই থেকে যায়। আর এই ক্রমাগত অপূর্ণতার দিকটি মনের কোণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে ঐ মানুষটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পর্কে আসে ভিন্ন ভিন্ন জটিলতা। কেউ কেউ সেই বিরূপতা-জটিলতাকে মেনে নিয়ে সম্পর্কে থেকে যায় কেউ আবার তা থেকে বেরিয়ে আসতেও সক্ষম হয়। কিন্তু প্রশ্ন জমাট বাঁধে; যে বা যারা সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে যায়, তা কতখানি সুস্থ ? বা সেখানে সত্যিই কি আর প্রাণ থাকে ? তাতে আন্তরিকতাই বা কতটুকু থাকে ? সেইরকম জিজ্ঞাসা সমন্বিত একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে লেখক তাঁর 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। এই সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে আমাদের উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির আত্মিক কাঠামো, তাদের মানসিকতা, কামনা-বাসনা সেই সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যায়ক্রমকে উপলব্ধি করতে হবে।

উপন্যাসের কাহিনীতে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দলাদলির প্রেক্ষাপটে একটি দাম্পত্য জীবন বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের নানাবিধ সম্পর্কের বাতাবরণও উঠে এসেছে। লেখক তাঁর 'আত্মকথায়' উল্লেখ করেছেন – নিজের জন্মভূমি সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল এই উপন্যাসে। শুধুমাত্র মানুষ গুলি নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, রুচি-সংস্কার, জীবিকাকেও এখানে পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে তুলে আনা হয়েছে। অর্থাৎ চেনা গণ্ডির পরিচিত মানুষগুলিকেই লেখক আরও বেশি সুপরিচিত

করে তুলেছিলেন। তবে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র এখানে বাস্তব চরিত্রগুলির পাশাপাশি অতিপরিচিত জন্মভূমিকে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু 'থিম' গড়ে তুলেছিলেন আপন জীবনবোধের সাপেক্ষে। সেই কারণেই, চরিত্রগুলিকে তিনি আবার নতুন করে এখানে সৃষ্টি করেছেন। পল্লী-প্রকৃতির কোলে লালিত সাধারণ নর-নারীর আপাত দৃশ্য নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনেও যে বিচিত্র সম্পর্ক অন্তঃশীলা ফল্গুধারায় বাহিত হয় তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লেখক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এখানেই তাঁর নিপুণ শিল্পদক্ষতা পরিস্ফুটিত। কাজেই, আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্রগুলির যে রূপান্তর পরিলক্ষিত হয় এবং সম্পর্কের সমীকরণের যে পট পরিবর্তন তা এই চেনা সীমানার সাধারণ চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে যেমন বিস্ময়কর তেমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলেই মনে হয়। নির্মাণ কৌশলের এই দক্ষতাতেই শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বতন্ত্র আসনে অধিষ্ঠিত।

সুবল ও তার স্ত্রী মঙ্গলা, নবদ্বীপ ও তার পুত্র মুরলী – এই চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের কাহিনী অগ্রগতি লাভ করেছে। পল্লী-বাংলার সমাজ কাঠামোয় আবদ্ধ স্থূলরুচি সমন্বিত ও ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন একটি মানুষের প্রতিচ্ছবি লেখক রূপায়িত করেছেন সুবল চরিত্রটির মাধ্যমে। দেখা যায় – সুবলের মনে তেমন কোন সৌখিনতা নেই; শুধু তাই নয়, সে ভীষণভাবে অপরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিতে নেই কোন মুগ্ধতা, আছে উকিল মোক্তারদের মতো বৈষয়িক চাল-চালানোর ক্ষমতা; পাড়ায় মোড়লি করবার দক্ষতা ও গর্ব। কেউ কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতে এলে তার বোকামিতে কীভাবে গালাগাল করতে হয় এবং নিজের ক্ষমতা জাহির করতে হয় তাতে সুবল ভীষণভাবে পটু। ঈর্ষার আধিক্যও তার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার অহংবোধ। গ্রাম-বাংলার সামাজিক কাঠামোতে সাধারণত দেখা যায় – গাঁয়ের মধ্যে যার অর্থবল সবচেয়ে বেশি তাকেই সকলে 'মাথা' অথবা 'মোড়ল' বলে গণ্য করে। কেননা, অর্থগত দিক দিয়ে সকলেই তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সেই সূত্রেই আলোচ্য উপন্যাসে সমাজের প্রধান ছিলেন বৃদ্ধ নবদ্বীপ। অতি কৃপণ ও ধূর্ত এই বৃদ্ধের প্রতি গাঁয়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষগুলি বোধ হয় নানা কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু আর্থিকভাবে তার প্রতি নির্ভরশীল থাকায় অর্থাৎ বিপদে-আপদে তার কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার দরুণ এই মানুষগুলি হয়তো তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে সাহস পেত না। এইভাবেই গতানুগতিক পথে তারা জীবন অতিবাহিত করে চলছিল। এমত পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে সুবল খানিকটা অর্থগত দিক দিয়ে সচ্ছল হয়ে উঠলে সকলে তাকে নবদ্বীপের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে থাকে। তাই

লক্ষ করা যায় – সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠক কিংবা সালিশি সভাতে সুবলকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এই বিষয়টি সুচতুর নবদ্বীপও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু স্থূল বুদ্ধির অধিকারী সুবল তা আন্দাজ করে উঠতে পারে নি। সে ধরে নেয়, তার বিচার-বুদ্ধি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাই সকলেই তার সমাদর করছে। সে ভাবে, এতদিন অন্তরালে থাকা তার এই বুদ্ধির আধিক্য নিজের কাছেও অজানা ছিল। তাই সকলে যখন তার মধ্যে এর সন্ধান পায়, তাতে যেন সুবলও বিস্মিত হয়, নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে সে নিজের জন্য গর্ববোধ করে। এ প্রসঙ্গে তার মনোভাব – "সুবল মনে মনে গর্ব বোধ করে, এক অসহায় অথর্ব বৃদ্ধ তার কাছে আশ্রয় চাইছে। সুবিচার প্রার্থনা করছে। দুর্বৃত্ত পুত্রের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। মঙ্গলা তাকে মানতে না চাইলেও হবে কী, সমাজে ক্রমেই সম্মান আর প্রতিষ্ঠা বাড়ছে সুবলের। শরিকি ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে সালিশ হিসাবে বুড়োদের সঙ্গে সুবলেরও ডাক পড়ে আজকাল। সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠক, সুবলকে না হলে চলে না; বিয়ে শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়াবার সময় জিনিসপত্রের অমন ঠিক ঠিক তায়দাদ করতে বুড়োরাও পারে না। চতুর, বুদ্ধিমান হিসাবে ক্রমেই নাম ছড়িয়ে পড়ছে সুবলের।"[১] অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন হয়ে সে আত্মগৌরব লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পাড়ার মোড়ল হওয়া সত্ত্বেও নবদ্বীপ তার দুর্বৃত্ত ছেলের জন্য সুবলের সাহায্য প্রার্থনা করার মূলে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত – নবদ্বীপ বুঝতে পেরেছিলেন যে সুবল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। তাই তাকে নিজের ছেলের দায়িত্ব অর্পণ করে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন। তাতে সুবল মুরলীর বিষয়ে তদারকি করলে গাঁয়ের আর কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না। দ্বিতীয়ত – মুরলীর মতো ডাকাবুকো পুত্রের জন্য নবদ্বীপের পিতৃহৃদয়ের গোপনে আছে গৌরব, কিন্তু তার বিপথগামিতা ও লাম্পট্যের জন্য আছে লজ্জা। নবদ্বীপ তার পুত্রকে নিয়ে যে গৌরববোধ করে, সেই দিকটি জানান দিতেই তিনি সুবলকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। অর্থাৎ নবদ্বীপের মত ধনী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ছেলেরই যে এমন বেশ-বাস পরবার ক্ষমতা থাকবে, গাঁয়ের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা সে হবে তাই স্বাভাবিক। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে সুবলকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। আর তিনি যে এ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন সকল পাঠকবর্গ-ই একমত। কারণ দেখা যায় – সুবল মুরলীকে নানা রকম উপদেশ নির্দেশ দেবে বলে তার সম্মুখে যখন উপস্থিত হয় তখন মুরলীর বিলাসবহুল বেশবাস -এর কাছে সুবল যেন ছোট হয়ে যায়। নিজের অপরিচ্ছন্নতায় সে অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। তার মনের এই দুর্বলতাকে

অনুধাবন করে নবদ্বীপ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাই সুবলের হীনমন্যতাকে আরও উস্কে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নবদ্বীপ বাইরে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেন – "তারপর, বললে কী নবাব ?"[২] তবে এই বৃদ্ধ মোড়লের অভিসন্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারিণী সুবলের স্ত্রী মঙ্গলার উপলব্ধিতে ধরা দেয়। এই কারণেই সে স্বামীকে এ কাজে যেতে বারণ করেছিল। সুবলকে বিরত করতেই সে তাকে নানা রকম কটূক্তি করে। এক্ষেত্রে সুবলের মনে হয় নবদ্বীপ মনে মনে হাসছে আর বলছে – "কী, খুব তো চোটপাট করে এসেছিলি, এখন কী হল! একটা কথাও কি বলতে পারলি আমার ছেলেকে ?"[৩]

সুবল চরিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে লেখক তাকে নানা দিক থেকে দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, সমাজের সকলে যখন সুবলকে নবদ্বীপের সমকক্ষ বলে গ্রহণ করে তখন নবদ্বীপকেও ছাপিয়ে যাওয়ার একটি বাসনা তার মনে জেগে ওঠে। আসলে এর মূলে ছিল তার তীব্র অহংবোধ। আর এই অহংবোধ থেকেই তার মনে ঈর্ষার আধিক্যও জাগরিত হয়। শুধুমাত্র নবদ্বীপ নয়, গ্রামে সচ্চরিত্র ও ভালোমানুষ বলে কীর্তনীয়া বিনোদের যে খ্যাতি ছিল তা সুবল ভালোভাবে নিতে পারেনি। এ বিষয়ে তার মনোভাবে – "বিনোদের স্বভাব চরিত্রের প্রশংসাই বিশেষভাবে এমন করে কেন করে লোকে ? পাড়ায় আরও তো পাঁচজন আছে যারা চোরও নয়, বদমায়েসও নয় কিন্তু তারা যেন লোকের চোখেই পড়ে না। ..... কেন মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকে সুবলের কাছে পরামর্শ করতে আসে ? বিনোদের কাছে গেলেই পারে! ..... সুবল বলে একটি লোক আছে, যার খোলে তেমন মিঠে হাত নেই, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে পরিস্কার মাথা, যা তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করে – একথা লোকের যেন খেয়ালই থাকে না।"[৪] এ যেন অবোধ বালকের ক্ষোভ প্রকাশ। কেবলমাত্র বিনোদ-ই নয়, স্ত্রী মঙ্গলার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, ব্যবহার সম্বন্ধে সকলেই যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তখনও ঈর্ষায় সুবলের মুখ কালো হয়ে যায়। সুবলের মনে হয় – "স্ত্রীর প্রশংসার মধ্যে যেন স্বামীরই নিন্দা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুবলের মনে ভয় হয় মাঝে মাঝে, তার সম্বন্ধে লোকে কী মনে করে ? তারা কি সন্দেহ করে যে সুবলের বুদ্ধি মঙ্গলার কাছ থেকেই ধার করা ? ..... এর চেয়ে একজন রোগাটে আর বোকা স্ত্রী যদি থাকত সুবলের তা হলে যেন সে বেশি সুখী হত, সমাজের কাছে আরও মান থাকত তার"[৫] এ আসলে যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত মানসিকতারই প্রতিধ্বনি। যেখানে নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেখতেই তারা অভ্যস্ত। এই মানসিকতার বশবর্তীতেই স্ত্রী মঙ্গলা রূপের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টি সুবলের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। রূপ

থাকাটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বলা যায় – সুবলের স্থূল দৃষ্টি মঙ্গলার হৃদয় সৌন্দর্যকে কখনোই উপলব্ধি করতে পারেনি। অনুধাবন করতে পারেনি তার অন্তরাত্মাকে। তাই ব্যক্তি মঙ্গলা সুবলের কাছে বরাবরই অপরিচিত ও অমনোযোগী তথা অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। কাজেই, খুব সহজে সুবল সন্তানহীনতার জন্য তার স্ত্রীকেই দায়ী করতে পেরেছে।

অপরদিকে, লেখক মঙ্গলা চরিত্রটিকে সুবলের ঠিক বিপরীত আদলে গড়ে তুলেছেন। মঙ্গলা স্বাধীনচেতা, বুদ্ধিমতী, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এমনকি, সে বেশ সৌখিন স্বভাবের। তার ঘরদোর সবসময় নিকানো ঝকঝকে তকতকে থাকে, আসবাবপত্রও থাকে বেশ মাজাঘষা সাজানো গোছানো। স্বামীর সঙ্গে যেহেতু মঙ্গলার রুচির মিল নেই সেহেতু মার্জিত রুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে দেখলে তার মনে স্বাভাবিকভাবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীর তুলনা আসে। এ প্রসঙ্গে সুদর্শন এবং সদালাপী বিনোদ -এর সম্বন্ধে মঙ্গলার মনোভাবকে তুলে ধরা যায় – "কিন্তু বিনোদকে যে মঙ্গলার মনে মনে ভালো লাগে, তার রূপের জন্য নয়, তার মিষ্টি গলা আর মধুর ব্যবহারের জন্য। ..... স্বামীর তুলনায় অনেক ভদ্র, অনেক মার্জিত বলে মনে হয়েছে মঙ্গলার।"[৬] অর্থাৎ মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্র অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষকেই মঙ্গলা স্বামী হিসাবে কামনা করলেও সুবল ছাড়া অন্য কাউকেই সে স্বামীর জায়গায় কল্পনা করতে চায় নি। আসলে মঙ্গলা সুবলকে স্বামী রূপে কল্পনা করলেও তার অমার্জিত রুচি-ব্যবহার ও অযৌক্তিক অহংবোধ -এর জন্য তাকে শ্রদ্ধা করতে পারেনি। তাই দেখা যায় – স্বামীর পৌরুষে আঘাত দিয়ে কথা বলতে মঙ্গলা যেমন ভালোবাসে তেমন স্বামীর সামনে নিজের মত স্পষ্ট করে প্রকাশ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সন্তানহীনতার জন্য মঙ্গলার মনে দুঃখ থাকলেও সেটা একান্ত তারই। এই দুঃখের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করেনি; এমনকি, কারও সহানুভূতিও সে গ্রহণ করতে চায়নি। মঙ্গলা তার একাকীত্বকে কাটাতে পাড়ার নানা মেয়েলী কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে, মুমূর্ষু রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেছে।

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে – এই দুই ভিন্ন মানসিকতা ও রুচির অধিকারী দুটি মানুষ যখন দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে সম্পর্কের পরিচয়ে শরীরকে স্পর্শ করেছে ঠিকই কিন্তু মনকে কখনোই স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে ক্রমশ মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে দু'জন মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জীবন-সমুদ্রে ভেসে চলছিল। সুবল তবুও ব্যবসার কাজে, পাড়ার সালিশির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে বেশিরভাব সময় বাইরে বাইরে লোকজনদের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু মঙ্গলা তার

গতানুগতিক বৈচিত্রহীন জীবনে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এই নিঃসঙ্গতা ও তার প্রতি সুবলের অমনোযোগিতা মঙ্গলার কাছে ভীষণ দুঃষহ হয়ে ওঠে। এসময় গাঁয়ে বসন্ত রোগের সংক্রামণে অন্যান্যদের মত কুরূপা আলতার রূপ আরও বিনষ্ট হওয়ায় সে যখন তা নিয়ে আক্ষেপ করে তখন মঙ্গলার মনে এক নতুন বোধ সঞ্চারিত হয় – "নিজের রূপকে আজ হঠাৎ ভারী দামী, ভারী মহার্ঘ বলে মনে হল মঙ্গলার। যেন হারাতে হারাতে তা হারায়নি, যেন দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় সামগ্রীকে হারাতে হারাতে মঙ্গলা ফের ফিরে পেয়েছে। ..... কিন্তু আর নিজের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলার যেন নতুন করে মনে হল এ-দেহ দুর্লভ, এই রূপ পরম আদরের, পরম উপভোগের সামগ্রী।"[৭] আবার বাল্যবিধবা আলতা যখন আক্ষেপ করে জানায় – স্বামীর মৃত্যুর পর পুরুষমানুষ দু'চারদিনের জন্য মনের মানুষ হয়ে পায়ে ধরে সেধেছে, চিরকালের ঘরের মানুষ হয়ে পায়ে রাখেনি। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলার যে মনের ভাব তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় – "মঙ্গলার কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যরকম সাধ যায় আজকাল। ইচ্ছা হয় দেখতে পুরুষমানুষ পা চেপে ধরলে কেমন লাগে। এতকাল তো পুরুষের পায়ের ওপর মাথা কুটে কপাল ফুলে গেল, এবার নিজের পায়ের ওপর ওদের কারও কপাল ঠোকা দেখতে ইচ্ছে করে। তাতে নিজের কপাল যদি পোড়ে পুড়ুক। সে পোড়ার মধ্যে হয়তো সুখ আছে।"[৮] আসলে, মঙ্গলার নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়েমী জীবনে এমন একটি ভাবনার আগমন ছিল অনেক বেশি স্বাভাবিক। আর মঙ্গলার মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নারীর পক্ষে যে নতুন কিছু করা সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ কিন্তু ভিতরে ভিতরে পিপাসার্ত এই রমণী নিজের জীবন সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হয়ে ওঠে। মনে তার চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। আর এমত পরিস্থিতিতেই মুরলী মঙ্গলার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে।

এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার তাগিদেই লেখক এই মুরলী চরিত্রটিকে খুব যত্ন নিয়ে গড়ে তোলেন। আসলে, আলোচ্য উপন্যাসে এই চরিত্রটির মাধ্যমে সুবল ও মঙ্গলার একঘেয়ে দাম্পত্য জীবন আর এক ভিন্ন পথে চালিত হয়। মুরলীর আগমনে এই দু'জন দম্পতির জীবনে যেমন এসেছে ঘটনার বৈচিত্র্য তেমন এই তিনটি চরিত্রেরই ঘটেছে মনান্তর। সত্যি কথা বলতে, সুবল ও মঙ্গলার আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয় রূপ যেভাবে সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা প্রকাশ্যে আনতে মুরলীর মত একজন লম্পট চরিত্রেরই প্রয়োজন। কেননা, এর আগে আমরা লক্ষ করেছি – ভবঘুরে সচ্চরিত্র বিনোদের প্রতি মঙ্গলার যেমন ভালোলাগা ছিল ঠিক তেমন বিপরীতভাবে মঙ্গলার প্রতিও বিনোদের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু তা সুপ্ত ভাবেই রয়ে যায়।

সামাজিক বিধি-নিষেধের গন্ডি অতিক্রম করেনি। আর তাছাড়া বিনোদের মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষের পক্ষে সমস্ত বাধ্য-বাধকতা অতিক্রম করে মঙ্গলার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনটাই নেই। এই কারণে সুবল-মঙ্গলার সংকটময় দাম্পত্য সম্পর্ককে উন্মোচিত করতে এবং তা আরও জটিলতর পর্যায়ে উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে মুরলীর মত একটি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। আসলে মুরলীর মত একজন লম্পটের পক্ষেই ব্যক্তিত্বশালিনী মঙ্গলাকে জয় করা সম্ভব।

মুরলী নব নব রূপের পিয়াসী। নিজ রুচি অনুযায়ী নিত্য-নতুন ভোগ-সম্ভোগে সে বিশ্বাসী। আবার দেখা যায় – স্বাদ যখন একঘেয়ে হয়ে আসে তখন নিরাপদে এবং অল্পায়াসে কী করে তাদের বর্জন করতে হয়, সে বিদ্যায়ও মুরলী সমান পারদর্শী। তার এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বশবর্তী হয়েই সে মঙ্গলার রূপ ও দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আসলে, আপাত দৃষ্টিতে মঙ্গলাকে পরিপূর্ণ বলে মনে হলেও এর অন্তরালে ছিল তার বুভুক্ষু সত্তার হাহাকার। তাই লক্ষ করা যায় – মুরলীর চারিত্রিক ত্রুটি সম্পর্কে সে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তার নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে মুরলীর এমন আকাঙ্ক্ষার গাঢ়তা মঙ্গলার মনকে টলিয়ে দেয়। এই কারণে প্রথম দিন আপত্তি করলেও দ্বিতীয় দিন পুনরায় মুরলী মঙ্গলার কাছে ফিরে এলে সে জোরালো ভাবে বাধা দিতে পারেনি। আসলে, মঙ্গলার চাহিদার শূন্যতার জায়গাটি মুরলী পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এই ঘটনার পর প্রাথমিক পর্যায়ে মঙ্গলা নিজের বিপথগামিতার জন্য অনুশোচনা করলেও পরে তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এ ছিল তার কাছে নবজন্ম লাভ। এ যেন মঙ্গলার নারীত্বেরই জয় ঘোষণা। 'বন্ধ্যা' নারীর গঞ্জনা থেকে মঙ্গলা তার এই গর্ভ-সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভের পথ খুঁজে পেয়েছিল। সেই জয়োল্লাসের মত্ততা তাকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করে রাখে। মঙ্গলা নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। অপরদিকে ঘটনাক্রমে স্বামী সুবলের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং এই পর্বে এসে খুব সহজেই বোধ হয় অনুধাবন করা যায় – সুবল ও মঙ্গলার পারস্পরিক সম্পর্ক জটিলতার কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে মঙ্গলার অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টিকে নিয়ে লেখক পল্লীসমাজকে সেভাবে তোলপাড় করেননি বরং তাকে ঘিরে দুটি মনের টানাপোড়েনকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে তোলেন। এখানেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়ে।

আলোচ্য উপন্যাসে মঙ্গলা চরিত্রটির যে পরিচয় ফুটে ওঠে তাতে সে যে তার কৃতকর্মের জন্য স্বামীর কাছে মাথা নত করবে না তা খুব স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় – মঙ্গলা স্বভাবিকভাবেই

পাঁচটা দিনের মত সংসারের সব কাজ করে, সুবলের পরিচর্চা করে, দুজনের জন্য আলাদা আলাদা বিছানা পাতে। স্ত্রীর এমন ব্যবহার, প্রকাশ্যে স্বামীকে এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব ও অনমনীয় স্বভাব সুবলের কাছে দুঃষহ হয়ে ওঠে। মঙ্গলার কাছে যা নবজন্ম লাভ স্বরূপ সুবলের কাছে তা তার পৌরুষহীনতারই নামান্তর মাত্র। এই ঘটনা আসলে তার পরাজয়কেই ঘোষিত করে। এই পরাজয় তার স্ত্রীর কাছে, মুরলীর কাছে পরাজয়। সুতরাং আত্মগ্লানিতে ক্ষত-বিক্ষত সুবলের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগ্রত হয়। সে মঙ্গলাকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করে।

তবে মঙ্গলা বাইরে যতই উদাস মনোভাব ব্যক্ত করুক না কেন, সে জানে এ ঘটনার পর সুবল আর কোনদিনই তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের মধ্যে যে স্বল্প আত্মিক যোগ ছিল তা এই পর্বে এসে পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই 'নষ্টনীড়ে' শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে যন্ত্রের মত জীবনকে চালিত করতে হবে। তবুও সে বেঁচে থাকতে চায়। কারণ এই বেঁচে থাকার মূলে ছিল তার মাতৃত্বের লোভ। মঙ্গলার প্রাণের দোসর তথা দ্বিতীয় সত্তা যে একটু একটু করে তার এই গর্ভে বেড়ে উঠছে তাকে সে প্রাণ ভরে দেখতে চায়। কাজেই, মঙ্গলার মধ্যে যে একটি মানসিক টানাপোড়েন গভীরভাবে কাজ করছিল তা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে মুরলী চরিত্রটির মানসিকতার পরিবর্তনও আলোচ্য উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা পাঠকরা জানি, মুরলী পাড়ার নানা যুবতী ও পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং সেখান থেকে নিজেকে মুক্তও করেছে। কিন্তু কোনওদিনই সে দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবেনি। তবে মুরলী এই প্রথম মঙ্গলাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ বলা যায়, একটি ঘটনা তিনটি চরিত্রেই মানস-কাঠামোকে পরিবর্তিত করে। যার উপর নির্ভর করে একটি সম্পর্ক বহুরূপে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় – সুবলের সঙ্গে মঙ্গলার মানসিকতার মিল ছিল না ঠিকই, বা স্বামীর কাছ থেকে মঙ্গলার অনেক চাহিদাই হয়তো পূরণ হয়নি। তা সত্ত্বেও মঙ্গলা স্বামী হিসাবে একমাত্র সুবলকেই ভাবতে পারে। তাই বলা যায় – মুরলী হয়তো মঙ্গলার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল, শূন্যতাকে দূর করেছিল, কিন্তু পরিবর্তে মঙ্গলা মুরলীকে কখনোই ভালোবাসতে পারেনি। আর পারেনি বলেই হয়তো মুরলী যখন বলেছে – "লুকোচুরি করতে আমিও চাইনে। চলো চলে যাই এখান থেকে।"[৯] তখন এই আহ্বানে মঙ্গলা সাড়া দিতে পারেনি। স্বামী হিসাবে মুরলীর কথা ভাবতেই মঙ্গলার প্রতিক্রিয়া – "স্বামী! কথাটা মনে হতেই মঙ্গলার সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ছি ছি ছি! না, না, না, মুরলী কোনদিনও মঙ্গলার স্বামী হতে পারে না। ভাবতে যেন কেমন লাগে, কেমন যেন বিসদৃশ শোনায় কথাটি।"[১০] তাই ঘটনাক্রমে দেখা যায় – একদিকে

সংকটাপন্ন সম্পর্কের বলয় অপরদিকে বেঁচে থাকবার নতুন প্রেরণা এই দুই-এর টানাপোড়েনে মঙ্গলা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকেই 'মুক্তির পথ' হিসাবে বেছে নেয়। সে স্বামীর পরিকল্পনা মত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। উপন্যাসের অন্তিম পর্বে সেই ভয়ঙ্কর নৌযাত্রার দৃশ্যটি এখানে বিশেষ স্মরণীয়। প্রবল জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে ছোট ডিঙি নৌকাটি ভাসতে ভাসতে ক্রমশ মৃত্যু-কূপের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মঙ্গলা স্বামীর প্রতি গভীর নির্ভরতায় বা বলা যায়, তাদের সম্পর্কের বাঁধনের প্রতি বিশ্বাস রেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে – "ওগো বাঁচাও"[১১]। জীবনের এত পটপরিবর্তনের পর সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে মঙ্গলার এখনো সুবলের প্রতি এই নির্ভরতা - বিশ্বাস তথা আবেগটুকুর প্রকাশ সুবলের মনকে উদাস করে দেয়। শুধু তাই নয়, তাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এক্ষেত্রে সুবলের প্রতিক্রিয়া – "অনেককাল পরে সুবলের সর্বাঙ্গ যেন আবার শিউরে সাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কোনও কথা ফুটল না।"[১২] তাই দেখা যায়, সুবল নিজের জীবন বিপন্ন করে সে তার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলে – "মঙ্গলা কোনও কথা বলল না। আঠার মত সে লেগে রয়েছে সুবলের দেহের সঙ্গে। সুবল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। জলের মধ্যে মানুষের ভার কমে যায় – এমনকি গর্ভিনী নারীকেও মনে হয় শোলার মতো হালকা।"[১৩]

এখানেই লেখক কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন। কিন্তু আমরা জানি, এখানেই সব শেষ হবে না। জীবনের দাবি কখনোই ফুরোয় না। মঙ্গলা ও সুবলের আবার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা শুরু হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় – মঙ্গলা সুবলকে ভালোবাসত কিনা তা প্রশ্নাযোগ্য বিষয়। তবে যে কোন সম্পর্কে একটি আবেগ জড়িয়ে থাকে। তার গভীরতা কম বা বেশি তা পরের প্রশ্ন, কিন্তু ঐ আবেগটুকুই চিরন্তন ও শাশ্বত। যার মাধ্যমে জীবন-সংসারের নর-নারী একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে মানুষগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ভেসে বেড়ায়, তাদের একত্রিত করবার মূল চাবি-কাঠি হল এই বিশেষ ভাবাবেগ। আর তা আছে বলেই মানুষ নানা জটিলতাকে অতিক্রম করেও জীবনের পথে এগিয়ে যায়, সমাজ টিকে থাকে, সভ্যতা বেঁচে থাকে। জীবনের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে উপন্যাসের এই দুই প্রধান পাত্র-পাত্রী তথা বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপ উক্ত আবেগের উৎসরণের মধ্য দিয়েই পরস্পরের সত্তাকে অনুভব করে, পরস্পর মিলিত হয়ে 'দ্বীপপুঞ্জ' গড়ে তোলে। তবে সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুভূতির গভীরতা কতখানি থাকবে, 'বাস্তবতা' কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই সম্পর্ক আবার কোন্ রূপ ধারণ করবে – সেই প্রশ্নগুলির উত্তর 'পরবর্তী

সময়' -এর কাছেই তোলা থেকে যায়।

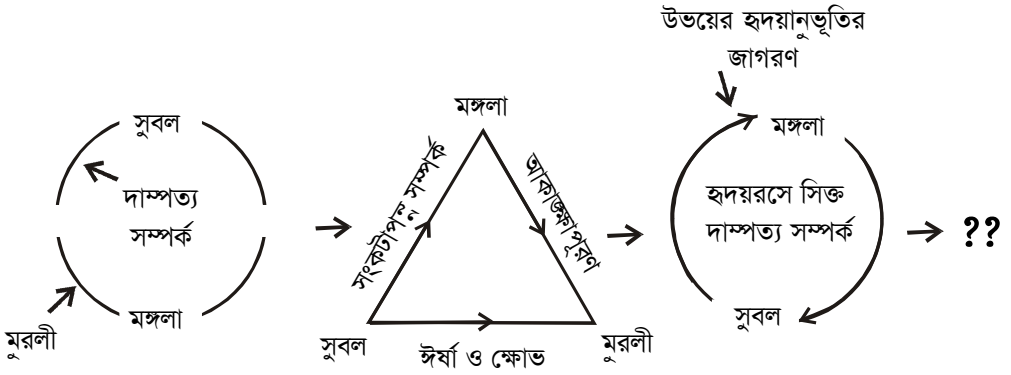


[ দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা ]

আলোচ্য উপন্যাসে সুবল ও মঙ্গলার দাম্পত্য সম্পর্কটি বিশেষভাবে আলোকিত করবার পাশাপাশি মুরলী ও মনোরমার দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপকে আর এক ভাবে উন্মোচিত করেছেন কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গৌণ হলেও সম্পর্কের ধারাটি মূল সম্পর্কের ধারাকেও প্রভাবিত করেছে। কোন নারী-ই স্বামীর বিপথগামিতা তথা চারিত্রিক ত্রুটিকে সমর্থন করতে পারে না। কাজেই আর পাঁচটা সাধারণ স্ত্রীর মতো মনোরমাও প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীর স্বভাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ফলে তাদের সম্পর্কও ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর গিঁটে আবদ্ধ হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। প্রথম যৌবনের সেই উন্মত্ততাকে পরিত্যাগ করে সে ত্যাগের মহিমাকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত্ব করে নেয়। তাই সে সব কিছুকে মেনে নিয়ে ঐ সম্পর্কের পরিচয়েই থেকে যায়। তবুও মাঝে মাঝে স্বামীর আবেগ ভরা কথায় তার মনও দুলে ওঠে। এইটুকুই বোধ হয় তার বেঁচে থাকবার মূল পাথেয়। জীবনের এই চেনা সংসারে এমন অচেনা সম্পর্কের অনেক ইতিহাস অলিখিত হয়েই থাকে। তারই একটি দিক এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের গভীর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বরাবরই সমাজের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত বলয়ে ফিরে এসেছেন এবং এখানকার অতি সাধারণ ও অত্যন্ত সুপরিচিত চরিত্রগুলিকে তুলে এনে তিনি কাহিনী নির্মাণ করেছেন। সেখানে দেখা যায় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও চরিত্রগুলি স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নকে ঘিরে তারা বেঁচে থাকে। আর এরই সূত্র ধরে নিজেদেরকে তারা বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পৃক্ত করে তোলে। কিন্তু কখনো কখনো বাস্তবের চরম আঘাতে তাদের স্বপ্নগুলিও ভেঙে যায়। এর ফলস্বরূপ তাদের জীবনের সেই সম্পর্কও তার

অভিমুখ পরিবর্তন করে। জীবন আরও একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার এককেই পরিবর্তমান সম্পর্কগুলি পরিচালিত হয়, আবার কখনও বা এরই সমান্তরালে নতুন আর একটি সম্পর্ক সূচিত হয়ে যায় – এই বাস্তব দিকটিই লেখক তাঁর **'অক্ষরে অক্ষরে'** উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই উপন্যাসে দু'জন যুবক-যুবতীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নানা স্তর অতিক্রম করে একটি পরিণতিতে এসে উপনীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বলা যায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালী মেয়েদের দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার রীতিটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্থকষ্টে জর্জরিত পরিবারের পক্ষে তথাকথিত অসুন্দরী ও স্বল্প শিক্ষিত একটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যে কতটা জটিল এবং তা কীভাবে পরিবারের সদস্যদের চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে – তারই একটি বাতাবরণ এর মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। সেখানে দেখা যায় – মধ্যবিত্ত সংস্কারে আবৃত একটি পরিবার তাদের প্রথম দুই কন্যাকে যথাক্রমে উকিল ও ডাক্তার ছেলের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলেও ছোট মেয়ে অর্থাৎ কাহিনীর কেন্দ্রিয় চরিত্র ঊর্মিলার জন্য তেমন সমকক্ষ পাত্রের সন্ধানে তারা ব্যর্থ। এর মূলে দুটি কারণ নিহিত, প্রথমত - অর্থ সংকট, দ্বিতীয়ত - পাত্রীর মধ্যে নিখুঁত সৌন্দর্যের অভাব।

এক্ষেত্রে লেখক ঊর্মিলার চরিত্রটিকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে দেখা যায় –"তিন বোনের মধ্যে লম্বায়-চওড়ায়, শক্তি-সামর্থে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবতী আর পরিশ্রমী হলে কী হবে, ঊর্মিলার রং শ্যামলী, মুখের ডৌলটুকু মোটামুটি সুন্দর হলেও নাক চোখা নয়, চোখ বড় নয়, মণির রং কটা কটা। ঠোঁট দুটি পাতলা কিন্তু দাঁতগুলি বড় বড়। তবু হাসলে সুন্দর দেখাত যদি কালো মাড়ি একটু বেশি রকম বেরিয়ে না পড়ত। মাথা ভরা চুল আছে ঊর্মিলার, সে চুল গোড়ালি পর্যন্ত না হলেও হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চুলের বাহুল্য কেবল তো মাথায় নেই, দুই বাহুতেও দেখা দিয়েছে।"[১৪] কাজেই এমন মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে পরিবার যে নানা ব্যর্থতামূলক অভিজ্ঞতার শিকার হবে তৎকালীন সামাজিক পরিকাঠামোর সাপেক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। তাই ঊর্মিলার এম.এ. পাশ অথচ বেকার দাদা নীলকমলই শেষ পর্যন্ত বোনের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসে এবং দেখা যায়, এ কাজের জন্য সে তাদের দীর্ঘ প্রচলিত মধ্যবিত্তের সংস্কার খণ্ডনে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যে বৈঠকখানার ঘরে সাধারণত অন্দরমহলের নারীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল সেখানেই এই প্রথম নীলকমল তার বন্ধুদের জন্য আড্ডার পরিবেশ গড়ে তোলে এবং তাদের আতিথেয়তার ভার বোনের উপর অর্পণ করে। উদ্দেশ্য ছিল – যাতে কোন পুরুষ-

বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণে ঊর্মিলা সমর্থ হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, আমরা নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই যে কোন রকম রূপের অধিকারী হই না কেন বা বলা যায়, আমাদের শারীরিক কাঠামো যেমনই হোক না কেন – এ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে আমাদের 'মন' বলে একটা বস্তু আছে। আর সেই মনে আপন জীবনকে কেন্দ্র করে নানা স্বপ্ন এসে ভিড় করে। তারা বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জাগায়। তাই বলতে হয়, আমাদের মত ঊর্মিলাও একজন সাধারণ মানুষ। নাই বা হল সে দিদিদের মত সুন্দরী, তবু তার মন তো স্বপ্ন দেখে। দিদিদের মত ও সমাজের আর পাঁচটা নারীর মত স্বামী-পুত্র সহকারে পরিপূর্ণ গৃহিণী হওয়ার স্বাদ তার মনেও জাগে। তাই হয়তো ঊর্মিলা তার দাদার এমন ব্যবস্থাপনায় কোনরকম আপত্তি জানায়নি। বরং সে প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়ে খানিকটা সংকুচিত হলেও আসলে ঊর্মিলা মনে মনে দাদার এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল ও আনন্দিত হয়েছিল।

তবে মনের কোণে এই স্বপ্নরা শুধুমাত্র জাল বুনেই ক্ষান্ত হয় না, তার বাস্তব রূপদানেও উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবার সাপেক্ষেই হৃদয়লোকে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা নামক অনুভূতিগুলির উৎপত্তি ঘটে এবং এগুলিই মূলত মানব-চরিত্রকে চালিত করে থাকে। এই বাস্তব বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখে কাহিনীতে ফিরে এলে দেখা যায় – নীলকমল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলেই মনে করে। কেননা, তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সরিৎ মুখার্জি একজন শিক্ষিত-মার্জিত ও অভিজাত পরিবারের সন্তান, উপরন্তু সে আর্থিক ভাবে সচ্ছল। তার মনে বোন ঊর্মিলার সম্বন্ধে এক ইতিবাচক ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে নীলকমল আভাস পায়। অপরদিকে দাদার এই কর্মপ্রয়াসকে ঘিরে ঊর্মিলার মনোজগৎ কীভাবে একটু একটু করে উন্মোচিত হয়েছে তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লেখকের কলমে উঠে এসেছে। লক্ষ করা যায়, প্রথমদিকে সেই বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে খানিকটা লজ্জা ও আড়ষ্টতা ঊর্মিলাকে আবিষ্ট করলেও ধীরে ধীরে সেই রহস্যময় ঘরখানিই তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। সাধারণ ঊর্মিলা ওরফে ঊমু সেখানে সকলের কাছে 'ঊর্মি দেবী' হয়ে ওঠে। নিজের এমন মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বের স্বাদ তাকে ক্রমশ বিস্মিত করে তোলে। সেই রহস্যময় সাম্রাজ্যের একমাত্র সাম্রাজ্ঞী যেন সে নিজে। এখানে এসেই ঊর্মিলা উপন্যাসের নায়িকার সঙ্গে আপন সত্তার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। তার মন রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

এইভাবেই ক্রমপর্যায়ে ঊর্মিলার হৃদয়লোক যখন বিকশিত হতে থাকে তখন তা সরিতের দ্বারা আরও বেশি প্রভাবিত হয়। তার প্রতি সরিৎ -এর দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে নিয়ে ছবি আঁকার বিষয়ে ঊর্মিলা বিস্মিত হয়। মনে তার নতুন রং লাগে। সরিৎ যখন বলে –"সাধারণ লোকে রূপ দেখে

আর পাঁচজনের ধার করা চোখ নিয়ে। কিন্তু শিল্পীর রূপদর্শন আর এক জিনিস। সে রূপ দেখে না, কুরূপ দেখে না, বস্তু কি ব্যক্তির স্বরূপ দেখে।"[১৫] শিল্পী সরিৎ -এর এমন ভাবনায় ঊর্মিলা আপ্লুত হয়। সুতরাং বলা যায়, এই সরিৎকে ঘিরেই ঊর্মিলার স্বপ্নরা ভাষা পেতে চায়। তার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণতা লাভে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। যেদিন সিনেমা হলে সরিৎ ঊর্মিলার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করেছিল, সেদিনই সমগ্র সত্তাকে এই পুরুষটির কাছে সমর্পণ করবার স্বাদ জেগেছিল ঊর্মিলার মনে। অর্থাৎ এখানেই দু'জন মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে একটি অলিখিত সম্পর্ক সূচিত হয়ে যায়, যা নীরবে ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে।

কিন্তু আলোচ্য কাহিনীতে লেখক সরিৎ চরিত্রটিকে শিল্পীর তুলনায় অনেক বেশি বিষয়ী ভাবনা দ্বারা গড়ে তুলেছেন। সরিৎ একজন সুনিপুণ 'Business Man'। ব্যবসায়িক বুদ্ধি বংশপরম্পরা অনুযায়ী তার রক্তে মিশ্রিত। এই আসল স্বরূপকেই সে তার কবি-সত্তা দিয়ে আড়াল করে রাখে। হয়তো বা কখনো কখনো ব্যবসার খাতিরে দ্বিতীয় রূপকে সে কাজেও লাগায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ভালো-মন্দের বাছ-বিচার ও সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আধিক্য সরিৎ -এর মধ্যে অনেক বেশি থাকবে। কাজেই, নীলকমল যখন ঊর্মিলাকে বিবাহ করবার প্রস্ত াব নিয়ে সরিৎ -এর কাছে উপস্থিত হয় তখন সরিৎ লাভ-ক্ষতির বিচারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা খারিজ করে দেয়। আর এখান থেকেই এক নারী হৃদয়ের স্বপ্ন ভঙ্গের পালা ঘোষিত হয়।

তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নদী যেমন নানা প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করেও উৎসে ফিরে না গিয়ে সামনের দিকেই এগিয়ে চলে ঠিক তেমনিই একটি সম্পর্কও সূচনালগ্ন থেকেই নানা চড়াই-উৎরাই -এর মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা অনুভূতিগুলি হয়তো সবসময় এক লয়ে বয়ে চলে না, তবে ঐ সম্পর্কের প্রতি মনের দুর্বলতা থেকেই যায়। ঊর্মিলার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে এসে কাহিনীর প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় স্তরে লক্ষ করা যায়, ঊর্মিলার মনোবেদনা ভুলাতে নীলকমল তাকে কর্মব্যস্ত করে তোলে। একটি ছাপাখানা খুলে তার সমস্ত ভার বোনের উপর ন্যস্ত করে। ঊর্মিলাও তার সর্বস্ব দিয়ে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসাকে একটা ভালো জায়গায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। যদিও এরই মাঝে সে সংবাদ পায় – সরিৎ ভালোবেসেই একজন সুন্দরী, শিক্ষিত, বিদূষী নারীকে বিয়ে করেছে। কিন্তু দেখা যায়, দেড় বছর পরে পুনরায় সরিৎ ঊর্মিলার সম্মুখীন হয়। সরিতের এই প্রত্যাবর্তন যে শুধুমাত্র ঊর্মিলার মনে প্রশ্ন জাগায় তা নয়, আমাদের পাঠকবর্গের মনেও প্রশ্ন উঁকি দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মনে হতে পারে, সরিৎ হয়তো তার দাম্পত্য

জীবনে সুখী হয়নি। তাই হয়তো কৃতকর্মের অনুশোচনায় পুনরায় সে ঊর্মিলার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আমরা জানি, লেখক এই সরিৎ চরিত্রটিকে অত্যন্ত সুচতুর, ধূর্ত এবং একজন নিপাট ব্যবসায়ী হিসাবেই গড়ে তুলেছেন। যার কাছে হৃদয়বৃত্তির তুলনায় বিষয়ী ভাবনা অনেক বেশি মূল্যবান। কাজেই সে নিশ্চয়ই এতদিন ঊমিলাদের প্রেসের ক্রম উন্নতির খবর সংগ্রহ করেছে। তাই আপন মুনাফা বৃদ্ধির আশায় সরিৎ নিজের লেখা কবিতার একটি বই যা অন্য প্রেসে ছাপিয়েছে তা দান করবার অজুহাতে পুনরায় ঊমিলার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, পরবর্তী সময়ে কিছু বই ছাপাবার প্রস্তাবে এবং নীলকমলের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সে তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিল। কেননা, সরিৎ জানতে পেরেছিল এই প্রেসের আসল মালিকানা ঊর্মিলার হাতে। শুধু তাই নয়, সে একজন কম্পোজিটারও। উপরন্তু হেমন্তের মতো একজন দক্ষ কম্পোজিটার তাদের কাছে বর্তমান। এছাড়া তার প্রতি ঊর্মিলার দুর্বলতার বিষয়টি সম্পর্কেও সরিৎ অবগত ছিল। সুতরাং এই দুর্বলতাকেই সে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এই কারণেই ঊর্মিলার কালিমাখা মুখের প্রশংসা করে সে তার মনের গোপন স্তরকে উস্কে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ঊর্মিলা পুনরায় তার মোহপাশে আবদ্ধ হয়। মন নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনে। তাদের সম্পর্কও আবার নতুন গতিমুখ খুঁজে পায়। তবে এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি – সরিৎ ঊর্মিলাকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে কখনোই তার সুন্দরী, মার্জিত স্ত্রী পর্ণাকে ডিভোর্স দিতে চায়নি। এ বিষয়ে সে স্ত্রীকে কখনোই কিছু জানায়নি। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, লেখক আসলে ঊর্মিলা ও সরিৎ এর সম্পর্কের বিকাশ ও পরিণতি টানবার উদ্দেশ্যেই পর্ণা ও হেমন্ত নামক চরিত্র দুটিকে নির্মাণ করেছেন। হয়তো এই কারণেই আমরা সরিৎ ও পর্ণার দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ সেভাবে স্পষ্ট রূপে পাই না। তবে ঊর্মিলাকে কেন্দ্র করে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক সংকটাপন্ন হয়েছিল তেমন কোন ছাপ ঊর্মিলা পর্ণার মধ্যে খুঁজে পায় নি। বরং তার বিপরীত রূপই সে প্রত্যক্ষ করেছিল। অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক গভীর ভালোবাসায় সম্পৃক্ত ছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সুন্দরী পর্ণার রূপ আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর তা প্রত্যক্ষ করেই হয়তো ঊর্মিলা আত্মদগ্ধ হয়েছিল। তার মনের এই দিকটি লেখকের বর্ণনায় উঠে এসেছে এইভাবে –"ঊর্মিলার বুকে কী যেন একটা কাঁটার মতো বিঁধল, দু'চোখে মুহূর্তের জন্য যেন ঝলক লাগল আগুনের। মেয়েদের রূপের সঙ্গে আগুনের শিখার তুলনা দেওয়া হয়। সে শিখা কি সত্যিই সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে পর্ণা ? তারই মতো একটা মেয়ে। ছিপছিপে গৌরাঙ্গী। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে তো আরও অনেক দেখেছে ঊর্মিলা, কাউকে দেখে এমন করে তো জ্বালা ধরেনি বুকে"[১৬]।

ঊর্মিলার আশঙ্কা যে সত্য তার প্রমাণ সে পায় – ডিভোর্স করবার প্রসঙ্গে পর্ণার দেওয়া যুক্তি সরিৎ -এর কণ্ঠে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার মাধ্যমে –"সৌজন্য নয়, মহানুভবতা নয়, কেবল ঘৃণা। .....ঊর্মিলা যদি তোমাকে কোনওদিন ছেড়েও যায়, তবু তোমাকে ছুঁতে আমার গা ঘিনঘিন করবে। তোমার প্রবৃত্তিটা দেখলাম একবার। আশ্চর্য, পৃথিবীতে কি আর মেয়ে ছিল না ?"[১৭] সরিতের এমন উপস্থাপন ভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ঊর্মিলার মনোভাব –"পর্ণার ঘৃণা যেন নিজের জিভের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে সরিৎ"[১৮] অর্থাৎ পর্ণা এখানে উপলক্ষ মাত্র। এই ঘৃণা সরিতের নিজের। সে যে কখনোই ঊর্মিলাকে ভালোবাসেনি বা কখনো ভালোবাসতে পারে না তার প্রমাণ সে এতদিনে পায়। সরিৎ -এর আসল স্বরূপ ঊর্মিলার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও একবার তার মোহভঙ্গ হয়। এতদিনে সে তার কালিমাখা মুখের প্রশংসার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে। তাই সরিতের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ঊর্মিলা জানায় –"...তা ছাড়া কপালে খানিকটা প্রেসের কালি মেখে আসতে পারি কিনা তাও দেখি চেষ্টা করে। ভুল হয়েছিল, স্নো, পাউডারের বদলে একটু কালি যদি মেখে যেতাম তাহলে দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হওয়ার কারণ মনে পড়ত।"[১৯] সুতরাং আর একটা পর্যায়ে এসে ঊর্মিলা ও সরিৎ -এর সম্পর্ক আরও একবার হোঁচট খায়। প্রবঞ্চক সরিৎ -এর প্রতারণা এবারেও 'অক্ষরে অক্ষরে' মিলে যায়। ঊর্মিলা এই প্রতারণার প্রতিবাদেই নিজের প্রেসের কম্পোজিটার হেমন্তকে বিবাহ করে। কেননা, ঊর্মিলা কম্পোজিটার হেমন্ত -এর মধ্যে শুধুমাত্র অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যাই নয়, হৃদয়বৃত্তিকেও খুঁজে পায় – যে হৃদয় থেকে উৎসারিত রসে ঊর্মিলা তার মনকে সিক্ত করতে চায়। যা দু'জন মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্কের মূল উপাদান স্বরূপ। এই হৃদয়বৃত্তির উপর তথা হেমন্তের প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং একটা নির্ভরতার জায়গা থেকেই ঊর্মিলা তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। নব-সম্পর্কের সূচনা করে। যেখানে কাজের জায়গায়, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং মনের সঙ্গে মনের পরস্পরের অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটবে বলে তারা আশা রাখে। সুতরাং, ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বস্তুজগতে নর-নারীর সম্পর্ক কত বিচিত্র পথ ধরে চলে, তার বহুমাত্রিক রূপকে নানা রচনার মধ্যে দেখিয়ে তাঁর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী যে কত স্বচ্ছ ও গভীর তা প্রতিভাত করেছেন।

দাম্পত্য জীবন সংকটের আর একটি রূপ প্রতিফলিত হয়েছে **'দেহমন'** (১৯৫২) উপন্যাসে। এটি প্রথমাবস্থায় **'রুবি রায়'** (১৩৫৭, ফাল্গুন) নামক মাঝারি ধরণের গল্প ছিল। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে গল্পটি 'দেহমন' নামে উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়।

পূর্বে আলোচিত 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে আমরা দেখি দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে একজন পুরুষের আগমন ঘটে এবং সেই পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীটি নতুন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে

দাম্পত্য সম্পর্কে আসে সংকট। আলোচ্য 'দেহমন' উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার বিপরীত বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি হল একটি নারী। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই উপন্যাসে 'থিম' হিসাবে একই বিষয় গ্রহণ করেছেন, তবে প্লট বিন্যাস করেছেন ভিন্ন আদলে, জটিলতার জালে আবৃত করে। ফলে আপাত দৃষ্টিতে একটি দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক বলে মনে হলেও এর অন্তরালে থাকা প্রকৃত রূপটি স্তরে স্তরে প্রকটিত হয়েছে।

জীবন-অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনবোধও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। সেই অনুযায়ী এক একজন মানুষের চাওয়া-পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা এক এক রকমের হয়ে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্ক এমন একটি সম্পর্ক যাকে সমাজ স্বীকৃতি দেয়। সেখানে দু'জন নর-নারী তথা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের সহায়তায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাহিদাগুলি পূরণ করতে চায়। কিন্তু তা সব ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ তা মেনে নিতে পারে না আবার কেউ কেউ মানিয়ে নিয়ে সেই সম্পর্কেই রয়ে যায়। মূলত জীবনের এই 'অপূর্ণতা'কে কেন্দ্র করেই পরস্পরের মধ্যে আসে মানসিক বৈষম্য। আর এরই প্রভাব পড়ে তাদের সম্পর্কে। সমাজ-সংসারে এমন বহু সম্পর্ক অলিখিত-ই রয়ে যায়। সেই সম্পর্কেরই নানা স্তর কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর রচনায় এক এক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'দেহমন' উপন্যাস তারই একটি দৃষ্টান্ত।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে বলা যায় – 'দেহ' ও 'মন' এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক পূর্ণতা পায়। অর্থাৎ 'মন'কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'দেহ' নয়, বিপরীতভাবে 'দেহ'কে বাদ দিয়ে কেবল 'মন' নয়। এই দুই-এর সমষ্টি-ই প্রয়োজন একটি সম্পর্কে। দাম্পত্য সম্পর্কে দেহ সহজলভ্য হলেও মন কতজন স্পর্শ করতে পারে তাতে প্রশ্ন থেকে যায়। আর সেই প্রশ্নকে ঘিরেই সম্পর্কের বিভিন্ন জটিলতা আবর্তিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় দুটি চরিত্রকে সেই নিরিখেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখা যায় – বিভাস ও উমা দুজন স্বামী-স্ত্রী। লেখক বিভাস চরিত্রটি এঁকেছেন নীতিবাদী, যুক্তিবাদী ও শিষ্টাচারী একজন মানুষ হিসাবে। যে স্বাভাবিকভাবেই আর সকলের মত নিজের জীবন সঙ্গিনীকে মনের মত করে পেতে চেয়েছে। তাই বিয়ের পর তার দাম্পত্য জীবনের এই পাঁচবছর ধরে বিভাস নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি-নীতি-মতাদর্শ ও ভালোলাগা, মন্দলাগা স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দমত গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের একটা মনোভাব সবসময় তার মধ্যে কাজ করেছে। বয়স তিরিশের এপারে হলেও বিভাস অনেক বেশি রক্ষণশীল ও সংস্কারে আচ্ছন্ন।

লক্ষ করা যায় – স্ত্রী উমাকে উপদেশ নির্দেশ দেওয়া তার দৈনিক রুটিনের অঙ্গ। স্ত্রী কেমন পোশাক পড়বে, কীভাবে কথা বলবে, কেমন আচার-আচরণ করবে তা বিভাস নিজ রুচি অনুযায়ী ঠিক করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, একবার উমা তার এক ননদের কথায় খুব জোরে হেসে উঠেছিল বলে বিভাসের প্রতিক্রিয়া ছিল – "দেখো, অত জোর করে হেসো না, বেশি উচ্চহাসি মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।.... আমি কী পছন্দ করি না করি, কী ভালোবাসি না বাসি, তা তোমার জেনে রাখা ভালো।"[২০] শুধুমাত্র নিজের পছন্দকেই জানায়নি বিভাস, জীবন সম্পর্কে সে স্ত্রীকে উপদেশও দিয়েছে – "জীবন থেকে আড়ম্বর বাদ দাও, অশন-বসনের জন্য অত আয়োজন কোরো না। বাইরের এ-সব স্থূল বস্তুকে বেশি মূল্য দিলে, জীবনে যা যথার্থ মূল্যবান, তাকে দেওয়ার মতো কিছু থাকবে না। অভাব অভাব কোরো না, অভাব যদি দূর করতে চাও – অভাববোধকে জয় কোরো।"[২১] এই উপদেশকে শুধুমাত্র মুখের কথা করে সে রাখেনি, সংসারের খাওয়া-পরায়, শখ-আহ্লাদে, আমোদ-প্রমোদে সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারেও তার সেই বড় বড় কথাগুলিকে খাটাতে চেষ্টা করে। সেখানেই হয় বিপদ, আর তা থেকেই শুরু হয় মতবিরোধ ও মনোমালিন্য। জীবনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব কথাকে লেখক অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় তুলে ধরেছেন –"সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজারের ছোট ছোট থলিতে অমন বড় বড় ভার আর আদর্শ ধরবে কেন। ধরেও না। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়।"[২২] ভাষাশৈলীর এমন রীতির উদ্ভাবক শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র এখানেই সকলের থেকে আলাদা।

দেখা যায়, এই পাঁচ বছরে উমা বিভাসের রুচি-অরুচি, পছন্দ-অপছন্দের কথা ভালোভাবে জেনেছে ঠিকই কিন্তু তার এই অতিরিক্ত যুক্তিবাদী মনোভাব উমা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি; সবসময় যেন সে এক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে। ফলে তা নিয়ে উমা স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান, ঝগড়াঝাটি যেমন করেছে তেমন বিষয়টি মা-বাবাকেও বার কয়েক নালিশ করেছে, কিন্তু সেরকম কোন প্রশ্রয় সে পায়নি। এক্ষেত্রে বলা যায় – নারী প্রথম জীবনে বাবার, মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্বামী এবং শেষজীবনে সন্তানের উপর নির্ভরশীল। সে ভাবনা তৎকালীন সমাজেও ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীতেও বর্তমান আছে। এর বাইরে মেয়েরা চরম অসহায়, অর্থাৎ নারীর জীবনে 'অবলম্বন' একটি বড় বিষয়। কাজেই, তাকে তোষণ করে চলতে হবে। সেই মানসিকতা থেকেই উমার বাবা রাজমোহনবাবু বিভাসকেই সমর্থন করেছেন। অপরদিকে, লেখক উমাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ বাঙালি বধূ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। সুতরাং তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এত বেশি নয় যে সমস্ত বন্ধন, পরাধীনতাকে অতিক্রম করে নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে

সক্ষম হয়। তাই মনের মধ্যে একরকম খামতি রেখেই উমা ধীরে ধীরে বিভাসের মতাদর্শকে মেনে নিয়েছিল অথবা বলা যায় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই, তাদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক গতিতে চললেও তাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল। আসলে তারা পরস্পর পরস্পরের 'মন'-এর নাগাল কখনোই পায়নি।

কাহিনীতে দুটি চরিত্রের মানসিক ও বাহ্যিক কিছু চাহিদার অভাব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিভাসের মানসিক এবং উমার কিছু বাহ্যিক চাহিদা ছিল, যা পূরণের ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের পরিপন্থী ছিল। এরকম পরিস্থিতিতেই তাদের দাম্পত্য জীবনের তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে পাশের ভাড়াটে রুবি রায়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিভাস ও উমার জীবনে রুবির উপস্থিতি অনুঘটকের মতো। সেই নিরিখেই কথাশিল্পী এই চরিত্রটিকে খানিকটা ভিন্ন আদলে গড়ে তুলেছেন। মূল কাহিনীকে ঘিরে রুবিকে নিয়ে যে উপকাহিনী রচিত হয়েছে তাতে দেখা যায় – উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রুবির জীবন-অভিজ্ঞতা একসময় তাকে পদস্খলিত হতে বাধ্য করে। তার পর থেকেই রুবির মধ্যে ভিন্ন জীবনবোধ গড়ে ওঠে। তারই বশবর্তীতেই সে তার জীবনকে পরিচালনা করে চলছিল। সে জীবনে শুধুমাত্র দেহ ছাড়া মনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অথচ এই নারীটিই অনেক স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদিন দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সেখানে স্বামীর সঙ্গে রুচি ও মতাদর্শের তীব্র পার্থক্য সে খুঁজে পায়। তার মতো দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নারীর পক্ষে সব মানিয়ে নিয়ে সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। তবে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা রমণীকে সমাজ কোন্ চোখে দেখে, জীবন তাকে কোন্ পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়, আলোচ্য উপন্যাসে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই রুবি রায় চরিত্রটি। সকলেই তাকে ভোগের বস্তু রূপে গ্রহণ করেছে কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি। লেখক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই চরিত্রটিকে এমন করে গড়েছেন। দেখা যায় রুবিকে কেন্দ্র করেই বিভাস ও উমার মানসিক এবং চারিত্রিক কাঠামোয় পরিবর্তন আসে। অপরদিকে রুবি জীবন সম্পর্কে এক গভীর সত্যকে উপলব্ধি করে এবং নিজের সত্তাকে নবরূপে অনুধাবন করে।

মানসিক কাঠামোয় স্বামীর সঙ্গে উমার পার্থক্য থাকলেও স্বামীর প্রতি তার যেমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তেমন তাকে নিয়ে সে গর্বও করত। কারণ আর সকল পুরুষের তুলনায় স্বামী মার্জিত, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান। এই জায়গা থেকেই উমা বিভাসের সঙ্গে রুবির পরিচয় করিয়ে দেয়। রুবির ধারণা সব পুরুষই সমান, তাদের কাছে নারী শুধুমাত্র ভোগেরই সামগ্রী। বিভাসও তার ব্যতিক্রম নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই রুবি বিভাসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে রুবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা ও তার সঙ্গে স্ত্রীর মেলোমেশা বিভাসের রুচিতে বাধে। বিভাস উমাকে বার কয়েক বারণ করে, কিন্তু তাতে সে ব্যর্থ হয়। তাই সে রুবির সঙ্গে মিশে তার থেকে উমাকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল। আর এই চাওয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিভাস ধীরে ধীরে রুবির সঙ্গে একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে উমার মনে হয় – কী একটা বড় জিনিস থেকে বিভাস তাকে যেন বঞ্চিত করে রেখেছে। আর সেই জিনিসটা যে কী তা সে উপলব্ধি করে স্বাধীনচেতা রুবিকে দেখে। উমার নতুন করে মনে পড়ল – "এ সংসারে সোহাগ আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই।"[২৩] কাজেই, রুবির স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা এবং তার সাজ-পোশাক যে উমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করবে তা খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে রুবির সম্পর্কে উমার অনুভূতি –"উমা যা হতে চেয়েছে অথচ হতে পারেনি, রুবি যেন তাই। ও উমার সেই দ্বিতীয় কল্পিত সত্তা। রুবি উমার সেই পরম কাঙ্ক্ষিত রূপ। ওর সঙ্গে উমা অভিন্ন অভেদ।"[২৪] তবে বিভাসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর পুরুষ সম্পর্কে রুবির দৃষ্টিভঙ্গি যে ভুল, তা প্রমাণিত হবে এমনটাই উমা আশা করেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায় – রুবির কথার জালে বিভাস হার মানে। এই বিষয়টি ছিল উমার কাছে প্রাথমিক ধাক্কা। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে বিভাস যখন রুবির বাহ্যিক সত্তাকে অতিক্রম করে তার অন্তরাত্মার সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়েছে তখন এই বিষয়টি উমার স্বামীর প্রতি থাকা এতদিনের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে আলোড়িত করেছে। ফলে তাদের মধ্যে যে মানসিক দূরত্ব ছিল তা ক্রমশবৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় নেমে আসে।

পাশাপাশি যে রুবি একদিন উমার কাছে ছিল দ্বিতীয় সত্তা স্বরূপ সে-ই তার পরম ঈর্ষার পাত্রী হয়ে দাঁড়ায়। এই ঈর্ষা প্রত্যেকটি নারীর রক্তে সম্পৃক্ত। কারণ কোনও স্ত্রীই স্বামীর প্রতি অধিকারকে ত্যাগ করতে পারে না। ঘটনাক্রমে দেখা যায় – বিভাস ও রুবি দুজনেই মুগ্ধ চিত্তে গল্প করতে থাকে আর সেখানে নানা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে উমা উপস্থিত হয় কিন্তু তাতেও তারা কোন ভ্রুক্ষেপ না করায় উমার সহ্যের বাঁধ ভাঙে। প্রতিক্রিয়ায় সে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে বসে। উমার এই ঈর্ষাতে রুবি কৌতুক বোধ করে। কাজেই বলা যায়, রুবি ও স্বামী বিভাসের প্রতি একরকম ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা উমার মনের কোণে জমতে থাকে। অপরদিকে কাহিনীর ধারাবাহিকতায় লক্ষ করা যায় – একদিন রুবি গভীর আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজের অন্ধকার ঘরে বিভাসের সামনে তার অতীত জীবনকে তুলে ধরে। আর তার মধ্য দিয়ে বিভাস যেন রুবির এক নতুন সত্তাকে আবিষ্কার করে। সে আরও একবার রুবির প্রতি মুগ্ধ হয়। আর

এই মুগ্ধতা রবি ঠাকুরের 'চোখের বালি'-এর বিনোদিনী ও বিহারীকে স্মরণ করায়। সেখানেও লক্ষ করা যায় – বিহারীর সামনে বিনোদিনীর ছেলেবেলা তুলে ধরবার মধ্য দিয়ে বিহারী বিনোদিনীর এক নতুন সত্তার সন্ধান পায়। আর এই পাওয়াকে কেন্দ্র করে যে হৃদয়ানুভূতির উৎসরণ ঘটে তা চিরন্তন ও শাশ্বত। আলোচ্য উপন্যাসেও এতদিনে একটি মন আর একটি মনের সন্ধান পায়। আর সেই মনে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী উমার প্রসঙ্গে তুলনা আসে, মনে প্রশ্ন জাগে –"উমা কি কোনওদিন ভেবে দেখেছে তার এই কঠিন উপদেশ-নির্দেশের অন্তরালে কোমলতা ফল্গুর মত লুকিয়ে থাকতে পারে ? উমা কেবল তার বাইরের সাত্ত্বিকতা দেখেই সংকুচিত হয়ে রয়েছে, সত্ত্বাকে অনুভব করবার চেষ্টা করেনি। আর রুবি ?"[২৫] এই তুলনাটা আরও জোরালো হয়ে ওঠে যখন রুবির অন্ধকার ঘরে বিভাসকে দেখে পা ও মুখ-ভরা বসন্ত এবং চোখ-ভরা আগুন নিয়ে উমা বিদ্রূপ করে –"বেরুলে কেন। এখন রাত সবে দুটো, আরও অনেক রাত বাকি ছিল। কাবার করে এলেই পারতে। .....খবরদার, আমাকে ছুঁয়ো না। আমাকে ছোঁয়ার কোনও অধিকার তোমার নেই। লম্পট বদমাস কোথাকার।"[২৬] এখানেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর প্রতি বিভাসের এক বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়, সমান্তরালে রুবির প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ সে বোধ করে। সেই আকর্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভাসের অভিব্যক্তি –"..... ও আকর্ষণের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা নেই, আর কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, বাৎসল্যের সঙ্গে নয়, স্ত্রীর ওপর স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে নয়, এ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"[২৭]

সুতরাং মনের এই ভাবনা রুবির সম্পর্কে নতুন করে বিভাসকে ভাবতে শেখায়। উপলব্ধি করে তার অগোচরেই কখন যেন মন আর একটি মনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর সেই মনেই রুবি নতুন রূপে ধরা দিয়েছে – "হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরা মেয়েটিকে নতুন করে ভালো লাগল বিভাসের। যেন নতুন রূপে দেখল। বিভাস ভাবল মানুষের ভিতরকার রূপ তো সবসময় দেখা যায় না। তার ওপর নানা ছদ্মবেশের আবরণ পড়ে। যে দেখবে তার দৃষ্টিও যে সবসময় স্বচ্ছ থাকে তা নয়। কত আত্মাভিমান আর সংস্কারে তা বারবার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুর্লভক্ষণে সেই ঢাকনা যখন সরে তখনই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিল হয়, রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে মানুষের কাছে মানুষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পরম যে আত্মীয় তার সঙ্গেও এই নিবিড় মিল কদাচিৎ ঘটে। সে মিল চকিত, অপ্রত্যাশিত, তাই একান্ত ক্ষণিক।"[২৮] কাজেই, জীবনের এমন একটি পর্বে এসে একদিকে মনের ক্ষুধা অপরদিকে দায়িত্ব-কর্তব্য এবং বিবেকের তাড়না বিভাস

চরিত্রটির মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল ঠিকই কিন্তু দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত সে বিবেকবোধকেই প্রাধান্য দেয়। তারই বশবর্তীতে সে তাদের ভগ্নপ্রায় সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে সন্তানের প্রতি যেমন অতিরিক্ত স্নেহবর্ষণ করে তেমন স্ত্রীকে ফুল ও শাড়ি উপহার দানে উদ্যত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, বিভাস এসব বাহ্যিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সে আসলে তার মনকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অপরদিকে উমা তার স্বামী ও রুবির ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অবগত হয়। আর তার প্রতিক্রিয়ায় তীব্র ক্রোধে-ক্ষোভে-ঘৃণায় সে স্বামীর আনা ফুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লক্ষ করা যায় – এই ঘটনা বিভাসের অন্তরাত্মাকে তিক্ত করে তোলে, ফলে তার মনে পুনরায় বিপরীত হাওয়া বইতে থাকে। তৃষিত মন আবার জেগে ওঠে। তাই বলা যায়, দাম্পত্য কলহের পর বিভাস স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তার মনে হয় – এ যেন কেবল আর্তকে, বঞ্চিতকে প্রবোধ দান। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, গভীর সহানুভূতির অভাব ঘটেছে। কিছুতেই নিজের হৃদয়কে স্ত্রীর দিকে উন্মুখ করে তুলতে সে পারছে না। এর জন্য মনে মনে সে পীড়িত বোধ করে। গভীর যন্ত্রণাবোধ হয়। দু'জনে ভিতরকার অতি-কোমল, অতি-সূক্ষ্ম সংবেদনশীল একটি অদৃশ্য তন্তু যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। এর জন্য বিভাস কেবল নিজেকেই দোষ দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে উমার দোষ আছে, অতি প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতাই এই দুর্ঘটনার জন্য বেশিরভাগ দায়ী। তাই উমাকে বিভাস সান্ত্বনা দিলেও তার মনে হয় – "স্ত্রীর জন্যে সে সহানুভূতি অনুভব করল, অনু কম্পায় মন ভরে উঠল। কিন্তু অন্তরের গভীর মূলদেশে কীসের এক উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। সে শুষ্কতা অশ্রুতে ভেজে বটে কিন্তু যাতে প্লাবিত হয়, সে রস আলাদা।"[২৯] সুতরাং বলা যায় – এই দু'জন দম্পতির মধ্যেকার সম্পর্কের চরম সংকটকে এবং উভয়ের মনের দুস্তর ব্যবধানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কোন হৃদয়রস তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জীর্ণতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। লক্ষ করা যায় – উমা তার জীবনের এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতে বাড়ির মালিককে অনুরোধ জানায় – রুবিকে বাড়ি থেকে তুলে দিতে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বিষয়টি তার বাবাকও জানায়। এই ঘটনায় বিভাস ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করে। স্ত্রীর প্রতি প্রবল ক্ষোভে-ঘৃণায় তার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সম্পর্কের এই বন্ধন তার কাছে দুঃষহ হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিভাস তার স্ত্রীকে জানায় –"আমার মনে হয় তোমার-আমার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক আর নেই। তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না, ভালোবাসতেও পারছ না। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা–প্রীতি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই – যা আছে তা শুধু অধিকারবোধ। কিন্তু একতরফা এই

অধিকার আইনের কাছে থাকলেও, হৃদয়ের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। স্বত্ত্ব নিয়ে মিথ্যে টানাটানির মধ্যে শুধু বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নেই।"[৩০]

বিচিত্র রহস্যে আবৃত এই মানব-মন। আর এর উপর-ই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল মানব সম্পর্ক। মনের জোয়ারে যেমন সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হয় তেমন তাতে ভাঁটার আগমন ঘটলে প্রাণহীন শুষ্ক সম্পর্কের কঙ্কাল জেগে ওঠে, তখন তা সামান্য আঘাতেই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বিভাস-উমার ক্ষুয়িষ্ণু দাম্পত্য সম্পর্কেরও চূড়ান্ত পরিণতি সেদিন হয়েছিল যেদিন নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভাস সকলের সামনে ঘোষণা করে রুবি-ই তার একমাত্র স্ত্রী। অপরদিকে উল্লেখ করতে হয়, জীবন অভিজ্ঞতা রুবির 'মন'-এর অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তার কাছে একমাত্র সত্যি হয়ে উঠেছিল দেহ। কিন্তু দেহের রহস্যও তার কাছে একসময় গতানুগতিক হয়ে ওঠে। তাই দেহ তথা জীবনের প্রতি তার উদাসীনতা জন্মে। রুবির ধারণা হয় – নারী-পুরুষের সম্পর্ক দেহজ সম্পর্ক। কিন্তু বিভাসের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে রুবির এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। শুধুমাত্র প্রবৃত্তিই নয়, প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়েও যে সম্পর্ক আছে তা-ই আসল সম্পর্ক – এই বিষয়টি রুবি উপলব্ধি করে। রুবি তার মনকে খুঁজে পায় আর একটি মন -এর স্পর্শে। তাই বিভাস যখন সকলের সামনে রুবিকে সামাজিক স্বীকৃতি দান করে তখন তারও মনে বিভাসকে নিয়ে ঘর-সংসার করবার স্বাদ জাগে। অন্যপ্রান্তে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উমা স্বামীকে কখনোও বুঝতে পারেনি, এই অভিযোগ বিভাস করলেও সমানভাবে বলতে হয়, বিভাসও উমাকে কখনো অনুধাবন করবার চেষ্টা করেনি। সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে শুধুমাত্র দায়-দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু উমার চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দেয়নি। আমরা পাঠককুল সকলেই অবগত যে, উমাও গভীর অভিমানে চেয়েছিল এই সম্পর্ক থেকে মুক্তি নিয়ে আবার নতুন সম্পর্ক স্থাপন করবে কিন্তু তা যে ওর পক্ষে সম্ভব নয় সে বিষয়ে উমা নিশ্চিত হয়ে যায়। এই সম্পর্কের বাইরে নিজেকে সে ভীষণ অসহায় মনে করে। তাই সে বারবার অধিকার বোধে স্বামীকে যত আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে বিভাস-এর কাছে সে বন্ধন তত অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষমুহূর্তে রুবিকে বিভাস স্ত্রী বলে স্বীকার করবে তা উমা কখনোই কল্পনা করেনি। তাই স্বামীর মুখে সেই কথা শুনে সে স্বাভাবিক ভাবেই মূর্চ্ছা যায়। দেখা যায়, জ্ঞান ফিরে পেয়েও অসহায় উমা সেই অধিকারবোধ ও স্বামীর প্রতি পরম নির্ভরতার জায়গা থেকেই আর্তনাদ করে ওঠে – "তুমি চলে যেয়ো না, তুমি ছেড়ে যেয়ো না।"[৩১] উমার এই আর্তি রুবির মনকে নাড়া দেয়। তাই লক্ষ করা যায় – রুবি বিভাসকে তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে

দিয়ে সে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। অপরদিকে উমা বিভাসের হাত শক্ত করে চেপে ধরে। এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু জীবন এখানে থেমে থাকবে না।

আসলে রুবি অনুভব করে তার ও বিভাসের সম্পর্ক কখন যেন দেহকে অতিক্রম করে মনে উত্তীর্ণ হয়েছিল। হৃদয়রসে সিক্ত তাদের এই সম্পর্ক ছিল প্রেমের সম্পর্ক – যার কাজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আনন্দ প্রদান করা। সেই সম্পর্ককে রুবি সংসারের চার দেওয়ালে পিষে মারতে চায়নি, তা দূর থেকে উপভোগ করতে চেয়েছে, মন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে একজোড়া মানুষ কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণহীন সম্পর্কের বন্ধনে পড়ে রইল। এই বিচ্ছিন্ন দুটি মন এক সঙ্গে থাকবে, হয়তো সংসার করবে, সন্তান পালন করবে কিন্তু কোনদিন একাত্ম হতে পারবে না। শুধুমাত্র সম্পর্কের নাম নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে। আবার হয়তো বা সময়ের তালে তালে তাদের সেই ভিন্ন খাতে, ভিন্ন আর এক রূপে বইতে থাকবে। তবে বলা যায়, এই 'দেহমন' উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের মধ্যে যে পৃথক পৃথক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কোনটিই পূর্ণতা লাভ করেনি। কেননা, বিভাস ও উমা পরস্পর পরস্পরের দেহকে স্পর্শ করেছে অথচ মনকে ছুঁতে পারেনি। অন্যদিকে বিভাস ও রুবির দুটি মন একাত্ম হয়ে উঠলেও তারা দেহের মধ্য দিয়ে সেই মনকে অনুভব করতে পারেনি। অর্থাৎ অপূর্ণ দুটি সম্পর্ক সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলেছে। এইভাবেই আলোচ্য উপন্যাসে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানব-মানবীর সম্পর্কের আর একটি ভিন্নতর দিককে রূপায়িত করেছেন, যা আসলে বাস্তবে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

গভীর ভালোবাসা শুধুমাত্র কাছে টানে না তা দূরেও ঠেলে দেয়। মানব-মানবীর সম্পর্কের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর **'দূরভাষিণী'** (১৯৫২) উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'দূরভাষিণী' এবং 'অক্ষরে অক্ষরে' এই দুটি উপন্যাসে 'থিম' হিসাবে একই বিষয় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে প্লট গঠনের ভিন্নতায় দুটি উপন্যাসের স্বাদ পৃথক পৃথক। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে জীবন জিজ্ঞাসার কঠিন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্তের সংস্কারকে ছাপিয়ে বহির্জগতে নারী কর্মমুখী হতে বাধ্য হয়। একদিকে দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের বিরামহীন চাহিদা পূরণ, অপরদিকে কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বাধ্যবাধকতার টানাপোড়েনে বিড়ম্বনাগ্রস্ত নারীর কাছে নিজ জীবনের দাবী গৌণ হয়ে ওঠে। তবুও কঠিন বাস্তবের ফাঁকে ফাঁকে

মনে জেগে ওঠে সেই বঞ্চিত নারীজীবনের ক্ষুধা ও আকূতি। এরই বশবর্তী হয়ে তারা যখন একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সেই সম্পর্কে স্বাভাবিকতা সবসময় বজায় থাকে না। তাতেও দ্বন্দ্ব-জটিলতা এসে ভিড় করে। নাগরিক সমাজের নারীদের প্রতিনিধি চরিত্র হিসাবে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে বীণা গুহঠাকুরতা চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন।

কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে সমরোত্তর কালীন বাজারে একটি টেলিফোন অফিসে বীণার চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় কাহিনীর কেন্দ্রিয় পুরুষ চরিত্র মৃন্ময়। সেই সূত্রেই তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে তা আরও গভীর হয়। তবে অস্থিরতাময় যুগ-কালের সাপেক্ষে এই মৃন্ময়কে কথাশিল্পী অনেকবেশি হিসাবী মানসিকতায় সম্পৃক্ত করে গড়ে তোলেন। মৃন্ময়ের সেই মন সুন্দরী, শিক্ষিতা ঘরোয়া এক নারীকেই জীবনসঙ্গিনী হিসাবে কামনা করে। কাজেই বীণার মত এমন অসুন্দরী, অপুষ্টাঙ্গী মেয়েকে যে মৃন্ময় কখনো ভালোবাসতে পারে এ তার বিশ্বাস হয়নি। তাই মৃন্ময়ের সঙ্গে বীণার ঘনিষ্ঠতার দিকটি বিবেচনা করেই বীণার বাবা মৃন্ময়ের কাছে তাদের বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে মৃন্ময় স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এর প্রত্যুত্তরে সে বীণার বাবাকে অপমান করে বসে। কাজেই এর প্রতিক্রিয়ায় বীণা ও মৃন্ময়ের সম্পর্ক যে স্বাভাবিকতা হারাবে তা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা যায় – বীণার মত মেয়েরা হয়তো কেবল মাত্র অর্থ উপার্জন করবার যন্ত্র রূপেই পরিবারের কাছে গুরুত্ব পায়। অপরদিকে সমাজের বেশিরভাগ পুরুষরা তাদের সান্নিধ্যে ও স্পর্শসুখ পেতেই উদ্‌গ্রীব কিন্তু রূপ-গুণের উর্দ্ধে উঠে তাদের সত্তাকে অনুভব করতে বোধ হয় তারা সক্ষম হয় না। লক্ষণীয়, মৃন্ময়ের এই প্রত্যাখ্যান বীণাকে আর একভাবে এই জীবনকে চিনতে শিখিয়েছিল। কঠিন জীবনাভিজ্ঞতার ক্ষণে তার তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। আসলে বীণার প্রেমানুভূতি দগ্ধ হয়ে তা তার আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সে মৃন্ময়কে এড়িয়ে যেতে থাকে। তবে ঘটনাক্রমে মৃন্ময়ের মনে বিপরীত হাওয়া বইতে থাকে। তার মনে হয় – বীণার মত মেয়ে তার প্রতি উদাসীন থাকবে এ বিষয়টি আরও বেশি লজ্জাজনক। তাই লক্ষ করা যায় – একদিকে মৃন্ময়ের বাবা সুন্দরী শিক্ষিতা একটি নারীর সঙ্গে মৃন্ময়ের বিবাহের বন্দোবস্ত করে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্যস্ত থাকে। অপরদিকে মৃন্ময় উপযাজক হয়ে বীণার বাবার কাছে শুধু ক্ষমা-ই চায় না, তাকে একটি ভালো চাকরির ব্যবস্থাও করে দেয়। এক্ষেত্রে বীণার বাবা সমস্ত অপমান ভুলে ক্ষুন্নিবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়। শুধু তাই নয়, মৃন্ময়ের হয়ে বীণার মন গলানোরও চেষ্টা করে।

সুতরাং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনের কোণে ঘনীভূত হওয়া বিদ্বেষ, অপমানের যন্ত্রণা, ক্রোধ বীণাকে আরও কঠোর ও রুক্ষ করে তোলে। তা মৃন্ময়ের প্রতি করা আচার ব্যবহারেও ফুটে উঠতে থাকে। তবে তার আচার–আচরণই যেন মৃন্ময়কে আরও বীণার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু মৃন্ময় যতবার বীণার কাছে উপস্থিত হয় স্বাভাবিকভাবে বীণা ততবারই তাকে এড়িয়ে চলে। উভয়ের মনের গোপন কথা অন্তরালেই থেকে যায়, তাদের পরস্পরের আত্মপ্রকাশের ভাষা আলাদা হয়ে ওঠে। দু'জনেই দু'জনকে ভুল বুঝতে থাকে। ফলে তাদের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মৃন্ময়ের মনেও বিদ্বেষ ও বিরূপতা জমে ওঠে। তার মনে হয় – তার প্রতি বীণা এমন আচরণ করতে পারে না। অর্থাৎ বীণার প্রতি একরকম অধিকারবোধ তার মনে ক্রিয়া করেছিল। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভালোবাসার প্রশ্নে মৃন্ময়ের মনে সুন্দরী নারীর প্রতিমূর্তি এলেও সে আসলে বীণাকেই ভালোবেসেছিল। তা মৃন্ময় স্বীকার করতে না চাইলেও আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। কেননা, বীণাকে প্রত্যাখ্যান করবার পর এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে মৃন্ময়ের বিয়ের বন্দোবস্তও হয়, অপরদিকে বীণা তার প্রতি উদাসীন মনোভাব পোষণ করে, তাই মৃন্ময় পুনরায় তার কাছে ফিরে না গেলেও পারত। কিন্তু মৃন্ময় না গিয়ে পারেনি। শুধু তাই নয়, বীণা যখন দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে অন্যান্য ব্যক্তি চরিত্রের সান্নিধ্যে এসেছে তখন প্রবল অধিকারবোধের জায়গা থেকেই মৃন্ময় ঈর্ষান্বিত হয়েছে। আর এই ঈর্ষাবোধ অন্তরের গভীর ভালোবাসা থেকেই জাত। অপরদিকে ঘটনাক্রমে বীণা অত্মসম্মান রক্ষার্থে একরকম জেদের বশবর্তী হয়েই সে বিমলকে বিবাহ করে। বিমল একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। সে চিত্রশিল্পী। বিমলের আত্মসর্বস্ব জীবনের একমাত্র অবলম্বন হল তার রুগ্ন বোন কমলা। কমলার মৃত্যুর পর বিমল অসহায় হয়ে পড়ে। বোনের জায়গা পূরণ করবার বিকল্প মানুষ হিসাবে সে কমলার বান্ধবী বীণাকেই খুঁজে পায়। বীণাকে আশ্রয় করেই বিমল বেঁচে থাকতে চায়। অন্যদিকে বীণাও তার একাকীত্ব জীবনে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেও অবলম্বন খোঁজে। বিমল ও বীণার এই মানসিকতার মিলনেই উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। জীবনের সঙ্গে তারা দু'জনেই বোঝাপড়া করে নেয়। তবে সুন্দরী মেয়ে পেয়েও মৃন্ময় আর বিয়ে করেনি। লক্ষ করা যায়, সময়ের ব্যবধানে মনের সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিদ্বেষ, ক্ষোভ ক্রমে ম্লান হয়ে গেলে বীণা ও মৃন্ময় দু 'জনেই তাদের ভালোবাসাকে অনুভব করে। তবে দাম্পত্য-সম্পর্কের বলয়ে আবদ্ধ থেকে বীণার মনের সেই অনুভব সমাজের চোখে নিষিদ্ধ হলেও মানব-মন যে সমাজের কোন বিধি-নিষেধের সীমানাকে স্বীকার করে না, সে বিষয়ে সকলেই আমরা অবগত। এই ভাবেই নর-নারীর সম্পর্কের আর একটি স্তরকে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই 'দূরভাষিণী' উপন্যাসে উন্মোচিত করেছেন।

সংসারের চেনা গণ্ডীতে আবদ্ধ মানুষের জীবন ও জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কগুলি যে কত বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, তারই এক পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস যেন উঠে এসছে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনবদ্য সৃষ্টি **'চেনামহল'** উপন্যাসটিতে। আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণ লেখক ব্যাঙ্গার্থে তথা বৈপরীত্যমূলক ভাবার্থে ব্যবহার করেছেন। কেননা, চেনামহলের প্রত্যেকটি চরিত্র একটি পর্যায়ে এসে আপনসত্তাকে নবরূপে উপলব্ধি করেছে এবং সেই সূত্র ধরেই তারা পরস্পরের কাছে হঠাৎ করে অনেক বেশি অপরিচিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ চেনা পরিবেশ-পরিমণ্ডলে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষই পরস্পরের কাছে অচেনা। আসলে কবিগুরুর ভাষায় আমরা সকল মানুষই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। আপন অস্তিস্ব রক্ষার্থে ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার তাগিদে আমরা সকলেই নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরের সঙ্গেও অভিনয় করে চলি। কাজেই আপন সত্তাকে আমরা ভুলিয়ে রাখি এবং ভুলে থাকি। অর্থাৎ 'মনন' -এর সকল স্তর সম্পর্কেই আমরা অবগত হই না। আর হয়তো, এই কারণেই নিজেরা নিজের কাছেই রহস্যময়ী হয়ে উঠি। যাই হোক, সময়ের তালে তালে বাহ্যিক সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপিয়ে সেই 'মনন' যখন আপন অস্তিত্ব ও চাহিদার জানান দেয় তখন নিজের কাছে যেমন নতুন লাগে, তেমন অন্যের কাছে আমরা অচেনা হয়ে উঠি। আলোচ্য উপন্যাসে কেন এবং কীভাবে চরিত্রগুলি বিবর্তিত হল সেই দিকটি আমরা এখানে বিশ্লেষণ করব।

'চেনামহল' উপন্যাসটি প্রথম 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৩৫৮-৫৯) প্রকাশিত হয়। এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন সম্পর্কের যে বাতাবরণ থাকবে তা খুব স্বাভাবিক। তবে তার মধ্যে মানব-মানবীর যে সম্পর্কগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে বা বলা যায়, পাঠকবর্গের হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে, সেগুলিকেই আমরা আলোচনার মুখ্য বস্তু হিসাবে গ্রহণ করব। সেই সূত্র ধরে আলোচ্য উপন্যাসে সম্পর্কের তিনটি স্তম্ভকে পাওয়া যায়। যথা –

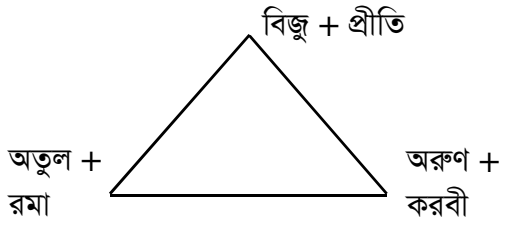


১) বিজু ও প্রীতির সম্পর্ক
২) অতুল ও রমার সম্পর্ক
৩) অরুণ ও করবীর সম্পর্ক

প্রথমে বিজু ও প্রীতির মধ্যেকার সম্পর্ক পর্যালোচনা করবার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, আর্থ-সামাজিক কাঠামো মানুষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে পরিপন্থী হিসাবে কাজ

করে। তাই বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মনের চাহিদার কখনোই মৃত্যু ঘটে না। কাজেই ব্যক্তি মানুষটির চেনা-পরিচিতি হোক বা তার বাইরে গিয়ে যেখানে যতটুকু সুযোগ পায় সে তার অন্তরের ইচ্ছা তথা আসক্তি পূরণের তাগিদে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সামাজিক মানদণ্ডে সম্পর্কের যে বৈধতা ও অবৈধতা থাকে তার গুরুত্ব লোপ পায় এবং সীমারেখার বিলুপ্তি ঘটে। আবার কারও পক্ষে হয়তো সামাজিক বিধি-নিষেধের সেই গণ্ডী অতিক্রম করবার সাহস হয়ে ওঠে না। তবে বিশেষ অনুভূতি মনের কোণে বারবার অনুরণিত হতে থাকে।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীসূত্রে উঠে আসে– বৈদ্যনাথের স্ত্রী কনকলতা বোন বাসন্তীর সমবয়সি হলেও সে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। বর্তমানে সে বিগত যৌবনের অধিকারী হলেও এখনো সেজেগুজে দাঁড়ালে বাড়ির অন্যান্য অনূঢ়া মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সবসময় পরিপাটি হয়ে থাকা তার অভ্যাস। রূপ সম্পর্কে সে অত্যন্ত আত্মসচেতন; এমনকি বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে রূপসী বলে মনে তার অহংকারবোধ বর্তমান আছে। অপর দিকে বাসন্তীর স্বামী হিসাবে অবনীমোহনবাবুর যে পরিচয় ফুটে ওঠে তাতে তিনি স্নিগ্ধ মসৃণ, গৌরবর্ণ এবং সুদীর্ঘ সুন্দর চেহারার অধিকারী। এই দু'জন মানুষ আত্মীয়সূত্রে যে সম্পর্কে আবদ্ধ তা হল – ননদ-জামাই ও সম্বন্ধীর স্ত্রী। আমরা জানি হিন্দু সমাজে এটি একটি ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক। অর্থাৎ তা ঐ দুই নর-নারীর আন্তরিক হওয়াকে স্বীকৃতি ও প্রশ্রয় দেয়। উপন্যাসে অবনীমোহনবাবু এবং কনকলতা এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ও একটা সময় মানসিক দিক দিয়ে তারা পরস্পরেই ঐ সম্পর্কের সীমানা লঙ্ঘন করে আরও গভীরে প্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ তা শুধুমাত্র ঠাট্টা-পরিহাসের পর্যায়ে থেমে থাকেনি। আসলে এই দু'জন নর-নারী পরস্পরের রূপযৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য অবনীমোহনবাবু তার দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী বাসন্তীর কাছ থেকে শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন যে চহিদাগুলির দাবী করেছিল সম্ভবত কোন কারণে তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তাই একই ছাদের তলায় একান্নবর্তী পরিবারে থাকবার সুযোগে কনকলতাকে ঘিরে মনের সেই বাসনাগুলি পূর্ণ করবার তার ইচ্ছা জাগে। হয়তো কনকলতার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। অপরদিকে বৌদির প্রতি স্বামীর অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব বাসন্তীর মনে আঘাত হানলেও, তাদের অবৈধ সম্পর্কের আভাস তার কাছে ধরা পড়লেও সে সম্পূর্ণভাবে তা স্বীকার করতে চায় না। কেননা, সেখানে বাসন্তীর অস্তিত্ব এবং অধিকারের সংকটের প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে। নারী মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় দিক এখানে উদ্ভাসিত। সুতরাং বলা যায়, এই নিয়ে বাসন্তীর মনে এক দ্বিধা ও সংশয় কাজ করছিল। আর তা থেকেই

কনকলতার প্রতি ঈর্ষাবোধ তার মনে জাগ্রত হয়। যা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান ছিল।

কাহিনীর শুরুতে মামীর প্রতি অরুণের এক বিশেষ সম্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে কনকলতা ও অবনীমোহনের সম্পর্কের ইঙ্গিত উঠে আসে এইভাবে –"তোর মামি ক'টা রে নান্তু যে রাঙা মামি বলছিস ? ফাজিল ছেলে। ....তোর বাবার গায়ে তো রং নেহাত কম নেই, তাহলে তাকে তো –"[৩২] তবে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ চূড়ান্তভাবে উন্মোচিত হয় বিজুর মৃত্যুর পর কনকলতাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে –"অবনীমোহন তক্তপোশ থেকে নেমে এসে দোরের সামনে কনকলতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, – 'না গেলেই কি চলত না ? মনে আছে এর আগেও কত ভাল ভাল বাড়ি আমি পেয়েছি। তবু যাইনি। তুমিই যেতে দাওনি মনে আছে সে কথা ? সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল কনকলতার। সেই প্রথম যৌবনের অতীত যেন কথা বলে উঠল। রূপ ধরে এসে দাঁড়ালো অবনীমোহনের মধ্যে। হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তারা তখন পরস্পরের অনেক কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মনে মনে দু'জনেই তা জানতেন, দু'জনেই তা স্বীকার করতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করার সাহস তাদের ছিল না।"[৩৩] উভয়ের মনের এই সংশয় ও ভীরুতা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সংক্রামিত করেছিল। আবার বলা যায়, তাদের মধ্যে যে সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল তা পরবর্তী সময়ে আর এক ভাবে তাদের সন্তানদের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। অর্থাৎ উভয়ের আবেগানুভূতি তাদের আত্মজার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এ যেন এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে ভাবানুভূতির সম্প্রসারণ। আর কেমন এই নব-প্রজন্মের রূপ – যেমন, বিজু ও প্রীতির সম্পর্ক তা আমরা পূর্ব-সূত্র ধরেই অন্বেষণ করব।

বিজু ও প্রীতি জন্মসূত্রেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। তারা মামাতো ও পিসতুতো ভাই-বোন। শৈশব থেকে পরস্পরে একই পরিবেশ-পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হয়েছে। রক্ষণশীল মনোভাবের ঘেরাটোপে আবদ্ধ প্রীতির কাছে পরিবারের বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ অচেনা। কাজেই মনের চাওয়া-পাওয়াগুলিকে পরিবারের এই চেনা গণ্ডী থেকেই তাকে পূর্ণ করতে হয়েছে। নিজের দাদাদের বাদ দিয়ে একমাত্র পুরুষ হিসাবে বিজুকেই দেখে এসেছে প্রীতি। শৈশবে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সম্পর্কের প্রভাব তাদের মধ্যে থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্ক অন্যমাত্রা লাভ করে। বয়সের ধর্মে এই দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের রূপ-যৌবনের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়। তাই আমরা লক্ষ করি, পড়াশুনার ছলে বা অন্য কোন অজুহাতে

তারা দু'জনেই উভয়ের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। এক বিশেষ অধিকারবোধ থেকেই বিজু তার ব্যক্তিগত কাজগুলি প্রীতিকে দিয়ে করিয়ে নেয়। অপরদিকে প্রীতিও তার প্রিয় মানুষটির জন্য সে কাজগুলি করতে পেরে আনন্দিত হয়। এই ভাবেই তাদের সম্পর্ক সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়ে চলছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, কনকলতা ও অবনীমোহনবাবু তাদের সম্পর্ককে স্বীকার করে নিলেও তারা পরস্পরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই সম্পর্ককে কখনোই পরিণতি দেওয়া সম্ভব নয়। অথবা বলা যায়, অন্য সকল বন্ধনকে উপেক্ষা করবার মত সাহস তাদের ছিল না। তাই তারা সংসারেই আবদ্ধ থেকে তাদের সম্পর্ককে নীরবে পালন করবার পথকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বিজু-প্রীতির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সম্পর্ক যে শুধুমাত্র ভাই-বোনের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে আবদ্ধ নেই, তার আভাস পেয়ে বিজুর বাবা বৈদ্যনাথবাবু যখন প্রীতির অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করেন তখন সেই মুহূর্ত থেকেই তাদের জীবনে সংকটের সূত্রপাত ঘটে। বিজুর ও প্রীতির পক্ষে দু'জনের বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া যেমন দুঃসাধ্য, ঠিক তেমন সমাজ কথিত তাদের এই অবৈধ সম্পর্কের মান্যতা প্রদান করা অবাস্তব বিষয় ছিল। এই বিষয়ে তাদের পরিবারের প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে তারা দুজনেই শঙ্কিত হয়। দেখা যায়, এই নানা দ্বন্দ্ব-সংকোচের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সহ মৃত্যুকেই সমাধান হিসাবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বলা যায়, কনকলতা ও অবনীমোহনবাবুদের তুলনায় বিজু-প্রীতিরা আর এক ধাপ অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু প্রীতি শেষপর্যন্ত কেন তার সংকল্প রক্ষা করতে পারল না, তার কারণ অন্য জায়গায় নিহিত আছে।

লক্ষণীয় বিষয়, ছেলে পক্ষের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রীতির নানারকম আপত্তি থাকলেও রণজিৎকে দেখে কিন্তু তার মন প্রসন্ন হয়েছিল। বিজুর সঙ্গে রণজিৎ -এর তুলনা প্রীতির সেই প্রসন্ন মনের ভাব থেকেই জেগে উঠেছিল – "যার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছে, তাকেও দেখল। ফরসা রং, ছিপছিপে চেহারা। দেখতে মোটামুটি ভালই। স্বভাব যে খুব গম্ভীর তা নয়, কিন্তু একটা গাম্ভীর্যের ভান করে রয়েছে। চোখ দুটি চঞ্চল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি বয়স হবে না। .... কুদর্শন প্রৌঢ় কাকার পাশে ভাইপোটিকে হঠাৎ ভারী সুন্দর মনে হয়। অবশ্য যতটা সুন্দর দেখা যায়, আসলে ততটা সুন্দর নয়। খুঁত আছে চেহারায়। রং শ্যামবর্ণ হলেও বিজু -এর চেয়ে অনেক সুপুরুষ, অনেক বেশি লাবণ্যময়।"[৩৪] আসলে বিজু ছাড়া এই রণজিৎ ছিল প্রীতির জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ। বলা যায়, রণজিৎ-ই ছিল প্রীতির জীবনের বাইরের জগতের

বার্তাবাহক তথা প্রতিনিধি-স্বরূপ। যেহেতু রণজিৎ বিজুর প্রতিদ্বন্দ্বী সেহেতু তার প্রতি প্রীতির দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন প্রকার ছিল। সেক্ষেত্রে অস্বস্তির তুলনায় রণজিৎ -এর প্রতি প্রীতির কৌতূহলই বেশি ছিল। আর এখান থেকেই প্রীতির মনের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। তাই বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাসর ঘরে রণজিৎ -এর সরস বাক্যালাপ প্রীতির মনে কোন বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়নি। বরং সে বিষয়গুলিকে উপভোগই করেছে। রণজিৎ -এর কোন আচরণেই সে প্রতিবাদ করেনি; এমনকি, তার সমস্ত আবেদন মেনে নিয়েছে, প্রীতি তার চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে দিয়েছে। তার এমন বিপরীত ক্রিয়ার সাপেক্ষে প্রীতি নিজের কাছে নিজে যে যুক্তি সাজিয়েছে তাতে মনের জোর ততটা ছিল না। আর ঘটনাক্রমে রণজিৎ স্বামীর অধিকারে প্রীতির শরীরকে যখন স্পর্শ করেছে তখন সেই স্পর্শসুখ যেন তাকে ভিন্ন এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে – যার স্বাদ অভিনব এবং অবর্ণনীয়। যার প্রভাবে প্রীতির চেনা পৃথিবী যেন নতুন রং-এ রঙিন হয়ে ওঠে। নতুন করে বেঁচে ওঠার লিপ্সা জাগে তার মনে। মনের এই নব জোয়ারে পূর্বকৃত সমস্ত সংকল্প বিলীন হয়ে যায় –"এই একটু আগে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে, চুমু খেয়েছে জোর করে। লোকটি নির্লজ্জ বর্বর কিন্তু ভারী দুঃসাহসী। কোনও দ্বিধা সংকোচের ধার ধারে না। .....কিন্তু আশ্চর্য সাহস লোকটির, আশ্চর্য শক্তি। বিজুর যদি এরকম সাহস থাকত। তা হলে প্রীতিকে অকালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত না। ভারী সুন্দর পৃথিবী, মধুর পৃথিবী। এখান থেকে কি সহজে কারও যেতে ইচ্ছা করে।"[৩৫] এই কারণেই প্রীতি শেষ মুহূর্তে তার মত বদলায়। কিন্তু মত পরিবর্তনের সেরকম কোন কারণ বিজুর সঙ্গে ঘটেনি। বধূবেশে থাকা প্রীতির রূপ বিজুকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। তবে তাকে শুধুমাত্র একমুঠো বেলফুল ছাড়া সেই মুহূর্তে বিজু আর কিছুই দিতে পারেনি। অথবা বলা যায়, কিছু দেওয়া বা নেওয়ার সাহস এবং সুযোগ কোনটাই তাদের ছিল না। তাই দুর্বলতাকে স্বীকার করেই বিজুকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তবে তার এতদিনের দেখা ও চেনা প্রীতির অচেনা সত্তাকে উপলব্ধি করবার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।

যেখানে এসে বিজু-প্রীতির সম্পর্ক ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে ঠিক তার বিপরীতে রণজিৎ ও প্রীতিকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। প্রথম সম্পর্কটি দ্বিতীয় সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রণজিৎকে ঘিরে প্রীতির মনে যে কৌতূহল জমে উঠেছিল বিজুর মৃত্যুর ঘটনায় তার বিলুপ্তি ঘটে। প্রীতির মনোভূমি রূপান্তরিত হয়। সুতরাং রণজিৎ -এর কাছ থেকে প্রীতি প্রথম যে স্পর্শানুভূতির স্বাদ পেয়েছিল পরবর্তী জীবনে তা আর কখনোই পাওয়া

সম্ভব নয় – এ বিষয়ে  হয়তো সকল পাঠকবর্গই একমত। এক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপে এক যন্ত্ররূপ মানব সত্তার প্রতি আর এক সত্তার থাকবে কেবলমাত্র ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও ঘৃণাবোধ। কেননা, এই ঘটনার পর রণজিৎ -এর পক্ষে প্রীতিকে সহজভাবে গ্রহণ করা যে কঠিন হবে তা খুব স্বাভাবিক। তাই বলা যায়, দুজনের দ্বারা রচিত এই 'নষ্টনীড়ে' পরস্পরে একটি সম্পর্কের শুধুমাত্র নামকেই বহন করে চলেছে বা ভবিষ্যতেও চলবে।

পরবর্তী স্তরে অতুল-রমার সম্পর্কের প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে আমাদের এই দুটি চরিত্রের মানসিক গঠনকে উপলব্ধি করতে হবে। অতুল আলোচ্য এই 'চেনামহল' উপন্যাসে সবচেয়ে প্রাণবন্ত চরিত্র। ধরে নেওয়া যায়, বেশিরভাগ পাঠকেরই হৃদয় জয় করতে সে সমর্থ হয়েছে। পুথিগত বিদ্যায় অগ্রসর হতে না পারলেও মানবিকতা তথা মূল্যবোধের দীক্ষায় সে অনেক বেশি পুষ্ট হয়েছিল। তার চরিত্রের এই সুপ্ত বৈশিষ্ট্যটি পরিস্থিতির চাপে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে। যা একসময় তার জীবনবোধকে পরিবর্তিত করে একজন পরিণত ও দায়িত্ববান মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

আমরা জানি, প্রত্যেকটি শিশুর মানসিক বিকাশের মূলে পারিবারিক পরিকাঠামো মণ্ডল ও বাবা-মায়ের বিশেষ অবদান জড়িয়ে থাকে। কাহিনী বিশ্লেষণে ধরা পড়ে – অবনীমোহনবাবু এবং বাসন্তী দু'জন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে মানসিক সাহচর্যের অভাব ছিল। কাজেই সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কখনোই তারা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে নি। অপরদিকে অবনীমোহন ছিলেন সংসার সম্পর্কে উদাসীন একজন মানুষ। তাছাড়া তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ তার কাছে ছিল না। তার এমন মানসিকতার প্রভাব আপন সন্তানদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি কখনো কখনো খুব শাসনও করেছেন আবার একেবারেই উদাসীন ভাবে সন্তানদের দূরে সরিয়েও রেখেছেন। সন্তানদের প্রতি স্নেহ-শাসনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। ছেলেবেলা থেকে অতুলের 'বয়ে' যাওয়ার পিছনে এটি একটি যেমন কারণ ছিল, তেমনই পড়াশোনায় ভাল বলে দাদা অরুণের প্রশংসায় পরিবার-আত্মীয়স্বজনের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি অতুলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করায় নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই পরিবারের ছোট-বড় সকলেই অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখতে থাকে। তথাকথিত 'ফাজিল ছোড়া' অকাজের মানুষ হিসাবেই তাকে নানা গঞ্জনা শুনতে হয়েছে – যা তাকে আরও অবনমনের পথে ঠেলে দিয়েছিল।

তেইশ-চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে এই অতুল তার তুলনায় দু'বছরের বড় বন্ধুর

দিদি রমার সান্নিধ্যে এসে জীবনকে নতুন ভাবে খুঁজে পায়। রমা তার নারীত্বের স্নেহ-ভালোবাসা ও অনুরাগের স্পর্শ দিয়ে অতুলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের জীবনে এই প্রথম কেউ তার দোষ-ত্রুটিগুলিকে ভালোবাসার মোড়কে আবৃত করে তাকে শাসন করেছিল, পরিমার্জিত করতে চেয়েছিল। জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষে চলবার জন্য অতুলকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। এই জায়গায় দাঁড়িয়েই অতুলের জীবনবোধ পরিবর্তিত হতে থাকে। অপরদিকে স্বামীত্যাগিনী রমা আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। সেও মনে মনে একজন পুরুষের ভালোবাসা কামনা করে। যার উপর বিশ্বাস করে তার এই বাকি জীবনকে সমর্পণ করতে পারে। আমরা লক্ষ করি, বাবার বাড়িতে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে রমা তার জীবনের শূন্যতাকে ভুলে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু যতবার সে ভুলতে চেয়েছে ততবারই যেন সেই শূন্য জীবন হাহাকারে আর্তনাদ করে উঠেছে। সেই সঙ্গে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হলেও পরিবারের সদস্যদের মনে তার অবস্থান কোথায় তা রমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে অতুলের এই উপস্থিতি যেন রমাকে এক নতুন জগতের বার্তা দেয়। যে জগৎ তার ইচ্ছা পূরণে যেন উদ্‌গ্রীব। কাজেই অতুলকে কেন্দ্র করে রমার মনের কোণে তারই অজান্তে এক নতুন আশা জন্ম নেয়। তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ রমার মানসিক পরিবর্তন সকলের চোখে পড়ে।

অপরদিকে অতুল জীবনে চলার পথে যেন এক নতুন উদ্যম খুঁজে পায়। সকলের অকাজের ছেলে অনেক বেশি কাজের হয়ে ওঠে। তাই আমরা দেখি, প্রীতিকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে আনার বিষয়ে সকলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেও অতুল কিন্তু সেই কর্তব্যকে না পালন করে পারে নি। এমনকি, সে মায়ের কথামত প্রীতির শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কোন বিরূপ আচরণ করেনি। বোন প্রীতিকে দেখে তার মনে যে সহানুভূতি ও মমত্ব জেগে ওঠে তা চিরন্তন ও শাশ্বত, যা থেকে সে বোনের দায়িত্ব নিতে মনে মনে প্রস্তুত হয়। মায়ের শরীর সর্ম্পকে সে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবেই সংসার সম্বন্ধে উদাসীন অতুল যেন অনেক বেশি সংসারী হয়ে ওঠে। স্বাধীনচেতা অতুলের কাছে সমাজের বিরূপ সমালোচনার পরিবর্তে জীবনের দাবী অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। তাই সে খুব সহজভাবেই বলতে পারে বিজু ও প্রীতির মধ্যেকার সম্পর্ক তার জানা থাকলে সুষ্ঠু পরিণতি দানে সে নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করত। সুতরাং বলা যায়, অতুলের মত এমন একজন মানুষই যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে রমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে দূর দেশে পাড়ি দেবে এটাই স্বাভাবিক। সমাজে প্রচলিত ধারণা আছে পুরুষের তুলনায় কম বয়স ও যোগ্যতার অধিকারী নারীকেই সাধারণত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ

করতে হয়। কিন্তু এখানে বলা যায়, অতুলের মত প্রাণের জোয়ারে ভরপুর একজন পুরুষই সমাজের এই গতানুগতিকতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করবার সাহস রাখে। আসলে এই সাহসের মূলে ছিল তাদের সম্পর্কের বাঁধনের দৃঢ়তা। যার ভিত্তিমূল এই মানুষের গভীরতর হৃদয়ানুভূতির সমষ্টিতে আবৃত ছিল। এই কারণেই সম্পর্কটির কাছে দুটি মনের চাওয়া-পাওয়া তথা জীবনের দাবী অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই রমা-অতুলের এই সম্পর্কটি এত বেশি সজীব এবং এর পরিণতিও স্বাভাবিক হয়েছিল।

আলোচ্য উপন্যাসের ট্র্যাজিক চরিত্র অরুণ ওরফে নান্তু। 'To be or not to be' -এর দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত। সুতরাং অরুণ ও করবীকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আজ সংকটাপন্ন। এর মূলে নানাবিধ কারণ বর্তমান আছে। কাহিনীর সূত্র ধরে অরুণ চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় – এই মানুষটি একান্তই আত্মকেন্দ্রিক। তবে আত্মসর্বস্ব এই চরিত্রের আত্মবিশ্বাসের যথার্থ অভাব ছিল। আর এই কারণে হয়তো জীবনের প্রতি নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য রেখে চলতে আমরা তাকে দেখি না। সাধারণত এই মানুষগুলি পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সর্বদা সক্ষম হয় না। ফলত তারা আরও বেশি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। একরকম হীনমন্যতা তাদের মধ্যে কাজ করে। তাই হয়তো দেখা যায়, কাহিনীর সূচনাতে অরুণ চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে এসে পরিবার তথা বন্ধু-বান্ধব কারও সঙ্গেই একাত্ম হতে পারেনি। আসলে, ছেলেবেলা থেকেই একান্নবর্তী পরিবারে লালিত অরুণ কখনোই পরিবারের সদস্য অর্থাৎ বাবা-মা-ভাই-বোন -এর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করতে এবং তাদের সঙ্গে আন্তরিক হয়ে উঠতে পারে নি। সুতরাং শৈশব থেকেই তাদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরী হয় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে যুক্ত হয় তার রুচির পার্থক্য। এমন এক পরিস্থিতিতেই সমরুচির অধিকারী ও খানিকটা শান্ত-নিরিবিলি পরিবারের অন্তর্গত এক নারী হিসাবে করবীর প্রতি অরুণ স্বভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। তার একাকী জীবনে এই আকর্ষণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তা থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছিল ভালোলাগা। তবে এই বিশেষ অনুভূতির সুষ্ঠু পরিণতি দানের কোন ভাবনা অরুণের মনে ছিল না। অপরদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে করবী বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এই কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তার কাছে জীবনের দাবীও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারই প্রতিক্রিয়ায় করবী অরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং দাদা হিরন্ময়ের সহায়তায় নিজেকে অরুণের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে সে উদ্যত হয়। কিন্তু কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে – পারিবারিক এক ঘটনায়

অরুণের মনান্তর ঘটে যায়। এই পরিবর্তিত মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় কাহিনীর একেবারে শেষ পর্যায়ে করবীকে লেখা অরুণের প্রথম ও শেষ একটি চিঠিতে। অতুল রমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলে একান্ত অসহায় ভাবে বাসন্তী শেষ পর্যন্ত অরুণের কাছে এসে উপস্থিত হয়। উক্ত ঘটনায় এই প্রথম অরুণ উপলব্ধি করে মা-ও তারই মত ভীষণভাবে একা ও অসহায়। এই বোধে এতদিনের মানসিক দূরত্বকে অতিক্রম করে সে মা-বাবার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। মনে তার সহানুভূতি জাগে। শুধু তাই নয়, এই একই একাকিত্ব ও অসহায়তার কথা ভেবে অরুণের মনে করবীর ছেলে পিপলুর জন্য অনুকম্পা জাগ্রত হয়। আসলে, করবীর শুধুমাত্র প্রেয়সী সত্তাই অরুণের মনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু প্রেয়সী, স্ত্রী ও মা মিলে করবীর যে পূর্ণাঙ্গ রূপ তাকে গ্রহণ করবার মত হৃদয়ের জোর অরুণের ছিল না। কাজেই সে ক্রমশ দ্বিধান্বিত হয়েছে। তাছাড়া সে তার শূন্য জীবনে এতদিন পরে বাবা-মাকেও আপন করে খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং, অতুলের মত করবীকে তার স্বজন-সংসার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি যেমন অরুণের নেই, তেমন করবীকে কেন্দ্র করে তার হৃদয়ের ভাবাবেগ ততটাও গভীরে প্রবেশ করেনি যে তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় সে বিজুর মত আত্মহত্যা করবে। কাজেই, সে অতুলের মত জীবিত বা বিজুর মত মৃত নয়, জীবন্মৃত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। তাই তাদের সম্পর্কও আজ জীবন্মৃত।

এইভাবে আলোচ্য উপন্যাসে চেনা চরিত্রগুলি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে চেনা সম্পর্কগুলিও রহস্য উন্মোচন করে অচেনা হয়ে উঠেছে। ফলে একই সম্পর্কের ধারায় বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে। নর-নারীর সম্পর্ক যে কত বিচিত্র পথে চলতে থাকে, কত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়, আজকের চেনা চরিত্র, চেনা সম্পর্ক যে কেমন করে জটিল হয়ে ওঠে তা এমনতর সব চরিত্র ও সম্পর্ক দিয়ে বোঝা যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাফল্য এখানেই।

মানব-মানবীর সম্পর্ক গভীর রহস্যের আবরণে আবৃত। ব্যক্তি-চরিত্রের হৃদয়ালোকের প্রভাবেই সম্পর্ক এমন রহস্যময় হয়ে ওঠে। আসলে, মানব-হৃদয় সর্বদা আপন সত্তার বাসনা পূরণেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্কগুলিও পরিচালিত-রূপান্তরিত হতে থাকে। মানব-মনের বহুমুখী স্তরের এই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের ধারা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে অত্যন্ত সহজ ভাষায় উঠে এসেছে। তা সে বিবাহের পূর্বে দুজন যুবক-যুবতী বা দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী কিংবা বৈধব্য জীবনে দ্বিতীয় কোন নারী বা পুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে কোন সম্পর্কই হোক না

কেন, তা সৃষ্টিলগ্ন থেকে নানা বৈচিত্র্যময় রূপক সঙ্গী করে একটি পর্যায়ে উপনীত হয়। এই বৈচিত্র্যের মূলে থাকে কখনো দুটি মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির পার্থক্য, কখনো পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, কখনো আর্থ-সামাজিক সংকট কখনো বা তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে বিশেষ জটিলতার বাতাবরণ তৈরী হওয়া – এই বিষয়গুলির সমষ্টিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে লেখক ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী নির্মাণ করেছেন, যা আসলে বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। এমনই একটি দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ-প্রকৃতিকে তিনি **'গোধূলি'** (১৯৫৩ সাল) উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের সূচনাপর্বে যে দুজন নারী-পুরুষের পরিচয় ফুটে ওঠে, তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ। লেখক এখানে এই দুই চরিত্রকে পরস্পরের বিপরীত আদলে নির্মাণ করেছেন। আমরা জানি, প্রত্যেক ব্যক্তিচরিত্র মাত্রই তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ চাহিদা বর্তমান থাকে। মনের গোপন কোণে এই কামনা-বাসনা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। আর মন এই বাসনা চরিতার্থ করবার নেশায় সর্বদা মত্ত থাকে। মানব-হৃদয়ের এই চোরা গলির গতি-প্রকৃতিকে লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র নানা কাহিনী নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এর বিচিত্র গতি-ধারাকে বিভিন্ন দিক থেকে তিনি তাঁর কলমে তুলে এনেছেন। মানব-মনের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদের জালে মানব সম্পর্ক কখন কীভাবে জড়িয়ে যায়, সম্পর্ক কতখানি প্রভাবিত হয় এবং শেষপর্যন্ত কোন্ সমীকরণে পর্যবসিত হয় তা আর এক ভাবে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি এখানে মূলত এক নারী-হৃদয়ের গোপন কুঠুরীর রহস্যভেদ করেছেন।

এই উপন্যাসের কাহিনীতে স্বামী হিসাবে অনুপম নামে যে চরিত্রটির পরিচয় ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায়, সে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের অধিকারী একজন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। তবে শরীরের সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা তার মননের সমস্ত স্তরকে স্পর্শ করতে পারে নি। কেননা, স্থূল রুচি সম্পন্ন এই মানুষটির মনে বিষয়ী ভাবনা অনেক বেশি প্রকট। তার চরিত্রের এই দিকটি প্রকাশিত হয় একটি বাড়ির লিজ-হোল্ডার হিসাবে বাড়ির অর্ধাংশ অন্যদের ভাড়া দেওয়ার প্রসঙ্গে। দেখা যায়, সে বেশি সেলামী পাওয়ার নেশায় আগত বিভিন্ন ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে দর কষাকষি করে। অনুপম মানুষটি জীবনে আড়ম্বর, বিলাসিতা ও চাকচিক্যকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়। তবে হৃদয়ের গভীরতা তার স্বল্প। অন্যের মতামত বিশেষত স্ত্রীর মতাদর্শ তার কাছে সর্বদা গুরুত্বহীন বলেই মনে হয়। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরম্পরাগত মানসিকতা তার রক্তে সম্পৃক্ত। আত্মসর্বস্বতা তার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। আপন ভাবনা দ্বারাই সংসার ও পরিবারের

সদস্যদের চালিত করবারই সে পক্ষপাতি। গৃহের কর্তা এবং একমাত্র উপার্জনকারীও সে নিজে। সুতরাং তার নিয়মনীতিই সংসারে একমাত্র প্রযোজ্য। তাই লক্ষ করা যায় – প্রতিবেশী চক্রবর্তীদের মাসিমাকে অনুপমের স্ত্রী ইন্দু তাদের বাকি ঘর দুখানা ভাড়া দেবে বলে কথা দেয় এবং তার সেই কথা দেওয়ার বিষয়টি অনুপমের কাছে তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয় দুটো কারণে – প্রথমত, একজন স্ত্রী তথা সাধারণ নারী হিসাবে তার মতামত ব্যক্ত করেছে, দ্বিতীয়ত, ঘরভাড়ার ক্ষেত্রে অগ্রিম কিছু অর্থ আদায় না করবার বোকামি রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অনুপম চরিত্রটির প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রেখে বলা যায়, ইন্দু যদি অনুপমের তুলনায় চক্রবর্তীদের মাসিমার কাছ থেকে বেশি টাকা অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করত তাহলে বোধহয় ঘর ভাড়া দেওয়ার প্রসঙ্গে অনুপমের মত পরিবর্তন হত। অর্থাৎ ইন্দুর কাজটিকেই সে প্রাধান্য দিত। কিন্তু ইন্দুর চরিত্র অনুযায়ী এই অগ্রিম বা সেলামী হিসাবে কিছু আদায় করার দিকটি খাপ্ খায় না। তার বিবেকে বাধে। তাই দেখা যায়, অনুপমের আচরণের প্রতিবাদে ইন্দুর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপম ক্ষিপ্ত হয়ে আপন মনের ভাবনাকে ব্যক্ত করে এইভাবে – "তার মানে তোমার মুখটাই মুখ, আর আমার মুখটা তো মুখ নয় – আচ্ছা, তোমার সাহসটা কী শুনি ? .....আর বাইরে বেরিয়ে রোজ হাজার জনকে যাকে মুখ দেখাতে হয় তার মুখের কথার দাম নেই, ঘরের কোণের মেয়েমানুষের মুখের কথার দামই বেশি। .....স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথার দাম নিজের কথার চেয়ে বড়।"[৩৬] অর্থাৎ এই উক্তির মাধ্যমে অন্যান্য বৈষয়িক দিক ও নারী জাতির প্রতি অনুপমের মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই আমাদের কাছে ধরা দেয়।

অপরদিকে, অনুপমের স্ত্রী রূপে ইন্দু চরিত্রটি লেখক ঠিক স্বামীর বিপরীত উপকরণের সমষ্টিতে চিত্রিত করেছেন। দেখা যায়, একত্রিশ বছর বয়সের অধিকারী ইন্দু স্বামী অনুপমের তুলনায় শ্যামবর্ণা – তবে সুন্দরী, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন একজন নারী। বিলাসিতা তথা আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের প্রতিই সে অনুরক্তা। দুই পুরুষ ধরে কলকাতা শহরে বসবাস করবার দরুণ শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি, চালচলন, নীতি ইন্দুর চরিত্রে পরম্পরা অনুযায়ী সঞ্চারিত হয়েছে। সেই তুলনায় অনুপমও এই শহরে বর্তমানে বাস করলেও তার স্বভাব অনেক বেশি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার প্রতি ইন্দুর ঝোঁক প্রবল। যার মধ্য দিয়ে সে আপন মুক্তির জগৎ রচনা করেছে। স্ত্রীর এই গুণটি স্বামী অনুপমের কাছে অসন্তোষের কারণ হলেও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ইন্দুর এই দিকের পরিচয় তুলে ধরে সে মনে মনে গর্ব বোধই করে। অন্যদিকে কাহিনীসূত্রে উঠে আসে ভাড়া বাড়িটি রং করবার প্রসঙ্গে স্ত্রী ইন্দু যখন আপত্তি জানিয়ে

বলে – "অত চড়া রং কি ভাল, তার চেয়ে সাদা রং করাও বেশি মানাবে।"[৩৭] এর প্রত্যুত্তরে অনুপম মুখ বাঁকিয়ে বলে – "হ্যাঁ, তোমার যেমন পছন্দ। সাদা রং একটা রং নাকি।"[৩৮] এক্ষেত্রে অনুপম চরিত্রটির মনোভাবের সপক্ষে লেখকের বর্ণনা তখন যুক্ত হয় এইভাবে – "স্ত্রীর রুচি আর পছন্দের উপর কোনওদিনই তেমন আস্থা নেই অনুপমের। ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ছেলেমেয়েদের জামা-জুতোর প্যাটার্ণ, রং পর্যন্ত অনুপম নিজে পছন্দ না করে দিলে চলে না, যেটা সে নিজে না দেখে সেটাই বেমানান হয়, আর তার মন খুঁতখুঁত করে।"[৩৯] তবে যারা ঘর ভাড়া নিতে আসে তাদের কাছে স্বামীর মিথ্যা কথা বলা, অনর্থক ছলচাতুরী করা এবং সেলামির নামে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি ইন্দু মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তার বিবেকবোধ বারবার আহত হয়। শুধু তাই নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে অনুপম যখন শেষ পর্যন্ত ঘর ভাড়া দিতে সম্মতি জানায় তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে সে যুক্তি সাজায় –"তাছাড়া দুশো টাকার সেলামি কি আমি না ভেবে-চিন্তে সহজে ছেড়ে দিয়েছি মনে করো ? কথা দেওয়ার আগে দু'তিন মিনিটের মধ্যে সব হিসেব করে দেখেছি। হিসাব ছাড়া কোনও কাজ করার মানুষ আমি নই। চিন্ময়রা এলে সুবিধা হবে কত, প্রথম তো ওই মা আর ছেলে ভিড় নেই, ঝামেলা নেই। ভাড়াটে এলেও মনে হবে না যে ভাড়াটে এসেছে। তারপর নিজে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনাটা কিছুই দেখতে পারিনে, চিন্ময়কে দিয়ে সে কাজও হবে। সকালে-বিকালে–"[৪০] স্বামীর এরকম হিসাবী ভাবনা ও রুচির বিকৃতি স্ত্রী ইন্দুকে নির্বাক করে দেয়। অনুপমের এরূপ নীচু মানসিকতায় সে কুণ্ঠা বোধ করে। আবার শুধুমাত্র মৌখিক কথার ভিত্তিতে অনুপম যখন চিন্ময়ের কাছ থেকে কিছু অগ্রিম অর্থ আদায় করে তখন ইন্দু জানায় –"তবু তোমার একবার বলা উচিৎ ছিল। ঘরটর আগে দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে ভাড়ার কথা পরে হবে। নিজেদের দোষ আগে থাকতে কাটিয়ে রাখা ভাল ছিল"[৪১] ইন্দুর এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধই প্রকাশ্যে আসে। এইভাবেই ছোট ছোট বিষয়ের মাধ্যমে লেখক যেমন দুটি চরিত্রের মানসিকতার ভিন্নতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে ধরেছেন তেমন সেই সঙ্গে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপও পরোক্ষভাবে আমাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে স্পষ্ট করেছেন –"বেশভূষা সম্বন্ধে ইন্দুর ঔদাসিন্যকে সুবিধা পেলেই অনুপম খোঁচা দিতে ছাড়ে না। আগেকার দিনে খোঁচাগুলির তীব্রতা ছিল বেশি। ইন্দুর মন নরম থাকায় বিঁধতও সহজে। আজকাল এসব মত-বৈষম্য, রুচি-বৈষম্য লক্ষ্য করবার বড় সময় হয় না, সুযোগও আসে না। .....তবু মতভেদ, ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব রক্ষার জেদ যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবারেই দেখা

দেয় না তা নয়।"[৪২]

অর্থাৎ রুচি বৈষম্য তথা ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধকে আঁকড়ে থাকা দুটি মানুষ শুধুমাত্র সম্পর্কের খাতিরে জীবন-পথ পাড়ি দিচ্ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-সংসারের যাঁতাকলে ইন্দু নিজের মনের ইচ্ছাগুলিকে ক্রমশ মেরে চলছিল। এমন গতানুগতিক জীবনধারায় সে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানসিক ক্ষুধা তার রয়েই গিয়েছিল। সেই বুভুক্ষিত মন বারবার মুক্ত আকাশে আপন সত্তাকে মেলে ধরতে চেয়েছে। মনের ইচ্ছাগুলি পূর্ণতা লাভের আশায় ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্তর্লোকের এই চাহিদাগুলি নানাভাবেই তাদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে চলছিল। তাদের সেই প্রচ্ছন্ন রূপকে প্রকট করে ইচ্ছামত বিচরণ করতে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঔপন্যাসিক তৃতীয় এক ব্যক্তি হিসাবে চিন্ময় চরিত্রটির আগমন ঘটান। যার সঙ্গে ইন্দু ঘটনাক্রমে তার হৃদয়ধর্মের মিল খুঁজে পায়। এবং সম-মানসিকতার আকর্ষণে সে বারবার চিন্ময়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়। ইন্দু যেভাবে নিজেকে পেতে চেয়েছিল, প্রকাশিত করতে চেয়েছিল সে সেইভাবেই চিন্ময়ের চোখে নিজেকে খুঁজে পায়। যা তাকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই একই বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে থাকার সুবাদে তারা আন্তরিক হয়ে ওঠে। স্বামী অনুপমের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে আপন হৃদয়জগৎকে চিন্ময়ের সংস্পর্শে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সে উন্মীলিত করতে চেয়েছিল। সংকীর্ণতাকে মোচন করে বাঁধনহীনের আনন্দধারায় সিক্ত হতে চেয়েছিল। আর তাই হয়তো আমরা লক্ষ করি – ইন্দুর মনের এই আশা পূরণে যাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয় এই কারণেই পাত্রী হিসাবে বাসবীকে চিন্ময় যখন অপছন্দ করে তখন কিন্তু ইন্দু মনে মনে খুশিই হয়। তবে একদিকে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নেশা অপরদিকে সনাতনী হিন্দু সংস্কারের টানাপোড়েনে ইন্দু ক্রমশ দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে। কেননা, সে পরস্ত্রী। চিন্ময়ের প্রতি তার এ আকর্ষণ সংস্কার-বিরুদ্ধ বিষয়। তাই লক্ষ করা যায়, সে লুকোচুরির আশ্রয় নেয়। আর তাতে যেন সে আরও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চিন্ময়ের প্রতি আপন মনের দুর্বলতা তার কাছে স্পষ্ট ভাবে ধরা দেয়। অর্থাৎ একটি মন আর একটি মনকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়।

তবে স্ত্রী মনের ভাবান্তর অনুপমের চোখেও ধরা পড়ে। ফলস্বরূপ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষয়িষ্ণু রূপ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে দেখা যায় – ইন্দুর সাদামাটা আড়ম্বরহীন সাজ-সজ্জায় চিন্ময়ের চোখে যখন মুগ্ধতার ঘোর লাগে তখন আড়াল থেকে এই দৃশ্য অনুপমের বুকে আগুন জ্বালায় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সে স্ত্রীকে জোরপূর্বক জমকালো শাড়ি-গয়নায় সজ্জিত করে মুখমণ্ডলে চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দেয়। এ প্রসঙ্গে তার মনোভাব ব্যক্ত হয় এইভাবে – "ঠিক

হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের স্ত্রী যে যাচ্ছে এখন আর তাতে সন্দেহ থাকে না। অনুপমের আর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। তার রুচি ইন্দুর সর্বাঙ্গ ঘিরে রেখে তাকে আগলে নিয়ে চলেছে।"[৪৩] এখানে অনুপম তার চারিত্রিক স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী আচরণ করেছে। তার এই হীন মানসিকতা যত প্রকাশ পেয়েছে পরোক্ষভাবে ইন্দু চিন্ময়ের প্রতি ততই আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে তাদের সংকটাপন্ন সম্পর্ক ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর পর্যায়ে উপস্থিত হয়। এর চূড়ান্ত রূপ হিসাবে তুলে ধরা যায় – চিন্ময় যখন মাতৃবিয়োগে শোকাতুর তখন ইন্দু তাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে এক হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। এই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় অনুপম স্ত্রীকে নিজেদের ঘরে এনে হাত মুচড়ে দেয় এবং চিন্ময়কে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে চিন্ময় বাড়ি ছেড়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। কিন্তু কাহিনীর শেষ প্রান্তে ইন্দু স্বয়ং চিন্ময়কে চলে যাওয়ার অনুরোধ করলে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চিন্ময় ইন্দুর ভেঙে যাওয়া হাতখানি ধরে তাকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়ার প্রস্তাব করে। আর তাতে ইন্দুর উত্তর – "এ সংসার থেকে বেরোবার রাস্তা তো আমার অত সহজ নয়। বেরোবার সময় যখন আসবে তখন আমি একাই বেরোব। ....হ্যাঁ একা। যে হাত আমার স্বামী ভেঙে দিয়েছেন সেই হাতই তুমি শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছো। প্রথমটায় বড় যন্ত্রণা পেয়েছিলাম, এখন আর ততটা নেই। আর একজনের ভেঙে দেওয়া হাত তোমার হাতের মধ্যে দেখতে দেখতে আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভারী মিল আছে। সে মিল এতদিন আমার চোখে পড়েনি, আজ পড়েছে। .....আমি তা চাইনে চিন্ময়, তুমি অবিকল আর একজনের মতো হও আমি তা চাইনে। তুমি আমার চোখে সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি আমার কাছে কতটুকু কী পেয়েছ জানিনে, দেওয়ার মত আমার কি-ই বা আছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে অনেক শিখেছি, অনেক পেয়েছি। এতখানি দিয়ে তুমি সে দান ফিরিয়ে নিও না চিন্ময়, আমার সব পাওয়া নষ্ট করে দিয়ে যেয়ো না।"[৪৪] ইন্দুর এই মনোভাবে যে শুধুমাত্র চিন্ময় বিস্মিত হবে তাই নয়, আমরা পাঠককুলও চকিত হই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, 'পরম্পরা' উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করেছি - শরীর ও মনের সমষ্টিতেই একটি ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করে। স্বামীর কাছ থেকে ইন্দুর শারীরিক চাহিদা মিটলেও তার মানসিক আকাঙ্ক্ষা রয়েই গিয়েছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা চিন্ময়ের সান্নিধ্যে পূরণ হয়েছিল। কিন্তু আপন মননকে প্রাধান্য দিয়ে সকলের পক্ষে সমাজ-সংসারের বেড়াজালকে ডিঙিয়ে চলে আসা সম্ভব হয় না। ইন্দুও প্রচলিত সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেনি। বাকী জীবন চলবার জন্য সে চিন্ময়ের শুধুমাত্র মানসিক দানটুকুকে পাথেয় হিসাবে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছে। কারণ শারীরিক দান তার আর প্রয়োজন

নেই। কেননা, চিন্ময় তাকে শুধু মাত্র মানসিক নয়, শারীরিকভাবেও আপন করে নিতে চেয়েছিল, যার ইঙ্গিত তার সেই হাত ধরবার মধ্যেই ইন্দু খুঁজে পেয়েছিল। শরীরের সেই একঘেয়ে যান্ত্রিক চাহিদায় ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র অধিকারবোধের ঘেরাটোপে পুনরায় ইন্দু নিজেকে আর আবদ্ধ রাখতে চায়নি। চিন্ময়ের কাছ থেকে পাওয়া মানসিক স্পর্শটুকুই তার বাকী জীবনের অক্সিজেন স্বরূপ। তাই বলা যায়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা জীব-জন্তু, পশু-পাখি এবং মানুষ নানা কাজে নিযুক্ত হয়ে বা আপন খেয়ালে বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে আহরণ করে পুনরায় গোধূলিলগ্নে যার যার নীড়ে ফিরে আসে। রাখাল তার গরুর পাল নিয়ে যেমন ধূলি উড়িয়ে উদাস মনে আপন গৃহে তথা 'মন খারাপের গর্তে' ফিরে আসে, ঠিক তেমনিই ইন্দু তার মনের পাখা মেলে নিজেকে আপন খেয়ালে নানা রসে সিক্ত করে পুনরায় সংসার তথা সমাজ স্বীকৃত দাম্পত্য সম্পর্ক নামক গর্তে ফিরিয়ে এনেছে। তাই আমরা দেখি, চিন্ময়ের স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার ঘটনায় অনুপম আনন্দে আপ্লুত হয়ে যখন স্ত্রীকে কোলে তুলে নেয় তখন তার প্রতিক্রিয়ায় সমান্তরালভাবে ইন্দুর মনের ক্যানভাসে প্রতিবিম্ব জাগে এইভাবে –"পাশাপাশি দুটি বাড়ির মাঝখানে সরু একফালি আকাশ। সেখানে সত্যিই সূর্যাস্তের রং লেগেছে। যতক্ষণ সেই রং আস্তে আস্তে মিলিয়ে না গেল, সন্ধ্যার ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে না গেল, অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইল ইন্দু। দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখল জোর করে। পাছে স্বামীর কানে যায়, পাছে নিজের কানে যায়।"[৪৫] এখানেই একটি নারী হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার উৎসারণ ঘটে যায়। একটি সম্পর্কের সঙ্গে আর একটি সম্পর্ক নীরবে, অলিখিতভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে যায়। বৈচিত্র্যময় মানব-সম্পর্কের আর এক রূপেরই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য এই 'গোধূলি' উপন্যাসে।

প্রতিক্রিয়াশীল মানব মনে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি কখন কীভাবে ক্রিয়া করে এবং তার সাপেক্ষে মানব-চরিত্রগুলির আচরণের পার্থক্য কেমন হয়, সম্পর্কই বা কীভাবে পরিচালিত হয় এর বৈচিত্রময় স্বাদ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা উপভোগ করেছি। আসলে এই সমাজ-সংসারের কঠিন বাস্তবতা এবং চরিত্রের রহস্যময় মনন লেখকের দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে অনেক বেশি সহজ ও স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। ঠিক এমনই আর একটি সাধারণ মানুষের মনের কোণে জেগে ওঠা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ক্রমশ পুঞ্জীভূত হওয়া অভিমান তাকে কোন্ পর্যায়ে টেনে আনে, একটি সম্পর্ক কীভাবে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে কোন্ স্তরে পৌঁছোয়, এর নানা গতিপথের ধারা লেখক তাঁর **'সঙ্গিনী'** উপন্যাসে প্রস্ফুটিত করেছেন।

একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতিকে লেখক এখানে আর এক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। জীবন গতিশীল। তাই চলার পথে বিভিন্ন অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সঙ্গী করেই তাকে এগিয়ে যেতে হয়। জীবনের এরূপ বয়ে চলার সঙ্গে মানব-সম্পর্কগুলির প্রবাহমানতার এক গভীর যোগসূত্র বর্তমান। অর্থাৎ জীবনের সব ভালো-মন্দই মানব চরিত্রকে এক এক ভাবে আলোড়িত করে। আর তা ধীরে ধীরে একসময় বহমান সম্পর্কে ক্রিয়া করে, যা সম্পর্কের গতিমুখ পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ একই সম্পর্কে বিচিত্র তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই 'সঙ্গিনী' উপন্যাসে লেখক সমরুচি ও শিক্ষার অধিকারী দুজন নর-নারীকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধেছেন। এর পূর্বে আমরা বিভিন্ন কাহিনীতে দেখেছি শিক্ষা, রুচি ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য এক একটি সম্পর্ককে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। কিন্তু এগুলির সমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের দ্বারাও একটি সম্পর্ক কীভাবে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে সেই দিকটিই এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করব।

উপন্যাসের কাহিনীতে  দেখা যায় – জয়া ও অমিয় পরস্পরকে ভালোবেসেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর তাদের এই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর একটি পর্যায় থেকে আলোচ্য কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। সেখানে দেখা যায় – জয়া বহুদিন ধরে টিবি রোগে আক্রান্ত থাকে। অবশেষে ছয় মাস হাসপাতালে থেকে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। স্বাভাবিক জীবনে তার এই প্রত্যাবর্তন যেন জন্মান্তরের সামিল। অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে জয়া তার এই জীবনকে যেন নতুন করে খুঁজে পায়। একদা ফিকে হয়ে যাওয়া এই পৃথিবী তার চোখে আবার নতুন রঙে ধরা দেয়। রঙিন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে গভীরভাবে আস্বাদন করবার জন্য তার মন উতলা হয়ে ওঠে। আমরা বলতে পারি, সদ্য রোগ-মুক্ত একটি মানুষের মনের এটি খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে জয়ার এই মানসিকতা লেখকের 'রোগ' গল্পের নায়িকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়ার মনের এই উচ্ছলতা তার শরীরকেও যে স্পর্শ করেছিল তা লেখকের বর্ণনায় উঠে আসে –"ফরসাপানা ভরন্ত মুখ, ভরন্ত যৌবন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে স্মিতমুখে কিন্তু বিস্মিত দুটি কালো চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই কি সে ? এ কি জয়ার নিজেরই প্রতিবিম্ব ? বিশ্বাস করতে যেন ইচ্ছা হয় না। এত সুন্দর স্বাস্থ্য বিয়ের পরে তার আর হয়নি। বিয়ের শুধু এক-আধ বছর আগে নয় আরও আগের সেই ষোল-সতেরোর প্রথম যৌবন যেন ফিরে এসেছে। নিজেকে দেখতে এত ভাল

লাগে। এত ভাল লাগে নিজের চোখ, মুখ, ঠোঁট, চিবুক।"[৪৬] অর্থাৎ সে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার আনন্দে আপ্লুত।

আসলে এই পর্বে তার আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। জয়ার কাছে তার এই নব-জীবনের চাওয়া-পাওয়াই অনেক বেশি বড় হয়ে উঠেছে। তবে তার মনের এই উদ্দাম তরঙ্গের সঙ্গে স্বামী অমিয় তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ। কেননা, সে অর্থ সংকটে ভীষণভাবে জর্জরিত। স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে অমিয় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়েছে। এই দানে যদিও সে সফল হয়েছে, অকাল মরণ থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পেরে তৃপ্তি বোধ করেছে ঠিকই, তবে ঋণের দায়ভার সর্বদা তার মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। দারিদ্র্যের ছাপ তার চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদেও প্রতিফলিত হয়েছে –"একমাত্র স্ত্রীর কথা ভাবা ছাড়া, তার চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা ছাড়া আর কোনও দিকে খেয়াল ছিল না অমিয়র। জয়ার রাজব্যাধির রাজকর জোগাতে সব শক্তি, সম্পদ, সামর্থ নিয়োগ করতে হয়েছিল ওকে। নিজের শ্রী, স্বাস্থ্য, খাওয়াপরা কোনও কিছুর দিকে তাকাতে সময় পায়নি, মন যায়নি। তাকাতে গেলে স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের টাকায় টান পড়বে যে।"[৪৭] এখনও সেই অর্থকষ্ট লাঘব করবার জন্য অমিয় জীর্ণ জামা-জুতোকে সম্বল করেই দুটি অফিসে অনবরত কাজ করে চলেছে। সুতরাং বলা যায়, বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি তার সমস্ত চিন্তাকে গ্রাস করেছে। সে চাইলেও জয়ার মত আবেগে ভেসে যেতে ব্যর্থ। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বোধ হয় দুটি মানুষের মানসিকতার সূক্ষ্ম পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। একদিকে নব-প্রাণের জোয়ার, অপরদিকে প্রাণ বাঁচাবার লড়াইয়ে ক্লান্ত এক সৈনিক আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

এমত অবস্থায় দেখা যায় – চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী অন্তরের আবেগের ইশারায় পূর্ণযৌবনে অবস্থানরত জয়া স্বামীর আদর-সোহাগ তীব্রভাবে কামনা করে। তার তৃষ্ণার্ত দেহ বিপরীত পক্ষের শরীরের দ্বারা গভীরভাবে সিক্ত হতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই সে পুনরায় ঘর সাজিয়ে, ফুলদানিতে ফুল রেখে, নব শয্যা রচনা করে স্বামীর অপেক্ষায় থাকে। অমিয়র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে গভীর আবেগে স্বামীকে 'নাইট ডিউটি'তে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু অমিয় স্ত্রীর এই আবদার অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও সে তার দায়িত্ব কর্তব্যের কাছে বাধা পড়ে যায়। তাই স্ত্রীর কাছে পরের দিন নাইট ডিউটি কামাই করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে বাধ্য হয়েই কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। তাতে লক্ষ করা যায় – জয়ার মনে খানিকটা অভিমান জমায়িত হলেও তার প্রতি স্বামীর কর্তব্য, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য্যের কথা স্মরণ করে মনের

সেই অভিমান প্রশমিত করে। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সে আবার নতুন আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু পরের দিন দেখা যায় – সেই একই বাসনা নিয়ে জয়া অমিয়র জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুম ভেঙে দেখে – তার স্বামী বুকে বালিশ চেপে বই লিখতে লিখতে সেও যেন কখন থেকে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে জয়ার মনের কোণে তীব্র অভিমান পুঞ্জীভূত করে। উক্ত অভিমান ঘনীভূত হয়ে ক্ষোভে পরিণত হয়। এই গভীর অভিমান ও ক্ষোভের সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়ায় জয়ার বুকের ভিতর জ্বলে উঠলেও চোখ জলে ভরে যায়। এই মুহূর্তে স্বামীর সেই সদ্ব্যবহার, সহৃদয়তাকে ছাপিয়ে স্ত্রীর মনে অন্য যুক্তি প্রবল হয়ে ওঠে – "এই লুকোচুরির কী মানে হয় ? কী দরকার ছিল এই গোপনতার ? বুঝিয়ে বললে কি জয়া বুঝত না ? এতদিন পর একটু আদর করলে, একটু কাছে টানলে কি সঙ্গে সঙ্গে রোগ সংক্রামিত হত অমিয়র মধ্যে ? রোগের এত ভয় অমিয়র ? জীবনের এত ভয় যে, ডাক্তারের সার্টিফেকেটও সে বিশ্বাস করছে না ? বিশ্বাস করতে পারছে না জয়াকে ? আর সেই জন্যে বার বার এমন করে ছলনা করছে, ভান করছে কাজের, ভান করছে নাইট ডিউটির ? .....কাজ কেবল কাজ। কাজের চেয়ে যেন মানুষের জীবন বড় নয়, তার স্বাস্থ্য, তার আনন্দ, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বড় নয়। কাজ তো সেই জন্যই। কিন্তু জয়ার মনে হল অমিয়র কাজ সেজন্য নয়। কাজ শুধু তার আত্মপ্রসাদের জন্যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। সবকিছু দিয়ে সবকিছুর বিনিময়ে সেই আত্মপ্রতিষ্ঠাই চায় অমিয়। স্বার্থপর, ঘোরতর স্বার্থপর।"[৪৮]

এইভাবেই বোধহয় প্রবৃত্তির তাড়না দুটি মানুষের মনের ব্যবধান রচনাতে ক্রিয়া করে থাকে। দেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সমান্তরালে ক্রমশ উপেক্ষিতা হওয়ার অপমানে জয়া উন্মত্ত হয়ে ওঠে, যা তাকে শরীর সম্পর্কে তথা আপন চাহিদার বিষয়ে আরও বেশি সচেতন করে তোলে। আসলে এই স্তরে তার দেহ সর্বস্ব মনই মুখ্য হয়ে ওঠে। এর নেশায় সে গভীরভাবে বেষ্টিত হয়ে থাকে। এই বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করবার উদ্দেশ্যেই লেখক অমিয়র দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই হিসাবে মনোতোষ নামক একটি চরিত্রকে প্রথম থেকেই উপস্থাপিত করেছেন। আসলে তিনি একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে পরিচালিত করবার ক্ষেত্রে আলোচ্য কাহিনীতে যৌন-প্রবৃত্তিকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শরীরের সাময়িক উত্তেজনা একটি স্বাভাবিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে সেই দিকটিই এখানে মুখ্য।

লক্ষ করা যায় – স্বামীর এমন উপেক্ষায় অপমানিত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে জয়া মনোতোষকে দেখতে পায়। গভীর রাতে মনোতোষের খোলা গায়ে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামের দৃশ্য জয়াকে আরও উতলা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ফুল সে মনোতোষকে

উপহার দেয়। এই দানের মধ্য দিয়ে মনোতোষ জয়ার দেহের ইঙ্গিতকেই খুঁজে পায়। তাই পরবর্তী পর্যায়ে নানা অজুহাতে সে জয়ার সংস্পর্শে আসতে চায়। তাতে জয়ার মনের ইচ্ছা থাকলেও তার বিবেকবোধ এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ মনোতোষেরও উদ্দেশ্য ক্রমশ ব্যর্থ হতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এক্ষেত্রে প্রায় অশিক্ষিত, স্থূল রুচিসম্পন্ন একজন মানুষ হিসাবে মনোতোষ জয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তার দীর্ঘ, শক্ত, মজবুত শরীরের গড়নই ছিল জয়ার আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ। অর্থাৎ এ ছিল একটি দেহের প্রতি আর একটি বিপরীত দেহের স্বাভাবিক চাহিদা। অপরদিকে ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায় – রোগমুক্ত হওয়ার পর জয়ার ডান পায়ের কড়াটার নীচে গোটার মত একটা কিছু দেখা যায়। ডাক্তার বন্ধু নির্মল এটিকে 'Cold abscess' বিবেচনা করে অমিয়কে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবার নির্দেশ দেয়। তাই কখনো কখনো অমিয়র মনেও আবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে – "অভিমানে মুখ ভার করে জয়া দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ও যে কী চাইছে তা অমিয় জানে। একবার ভাবল দেয়। ওর প্রত্যাশা পূরণ করে, রক্তবর্ণ অপূর্ব সুন্দুর দুটি ঠোঁট চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় অমিয়। কিন্তু পরক্ষণেই নির্মল ডাক্তারের কথা ওর মনে পড়ে গেল। এখনও জয়া ভাল করে সেরে ওঠেনি। এখনও ওর পায়ে রয়েছে কোল্ড অ্যাবসেস। তার চিকিৎসা এখনও আরম্ভ করা হয় নি। এ সময় ওর আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাকে বাড়িয়ে তোলা মোটেই সঙ্গত হবে না। রোগী তো কুপথ্য চাইবেই। কিন্তু কোনও হিতৈষী কি তা দিতে পারে!"[৪৯] কাজেই, জয়ার ভালোর জন্য, তার স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে অমিয় নিজেকে সংযত করেছে। এখানেই স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মনোতোষ এই 'Cold abscess' কে তার শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এই নতুন রোগের কথা জয়াকে জানিয়ে তার নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতি মনোতোষ অনুকম্পা দেখায়। প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে সদ্য ফিরে এসে জয়া তারই পুনরাবৃত্তির কথা শুনে আর্তনাদ করে ওঠে এবং সে এতদিনে স্বামীর এমন উদাসীন মনোভাবের কারণ খুঁজে পায়। কাজেই বেঁচে থাকবার তীব্র বাসনায় মনোতোষের মত একজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে গভীর আবেগে সে আঁকড়ে ধরে। স্বামীকে ভুল বোঝাবার চূড়ান্ত রূপ এখানেই প্রকাশিত। ফলত দুটি মনের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মনোতোষ সুযোগ নেয়। দুটি বুভুক্ষু শরীর পরস্পরের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করে। তবে লক্ষণীয়, প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার সমান্তরালে জয়ার মনের সংস্কারবোধ জাগ্রত হয়। স্বামীর কথা মনে করে সে খানিকটা অনুতপ্ত হলেও এই ঘটনার জন্য জয়া অমিয়কেই দায়ী করে। তার প্রতি স্বামীর উদাসীনতা ও অবহেলার দরুণ এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটেছে বলে সে মনে করে। সে-কথা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সে অমিয়র উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে

জানিয়ে গিয়েছে। এর পরও স্বামীর কাছে থেকে যাওয়া মানে সারাজীবন তার ঘৃণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা, যা জয়ার আত্মসম্মানে আঘাত করে। তাই সে অমার্জিত ও অসম রুচির অধিকারী একজন পুরুষকেই সঙ্গী করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এখান থেকেই জয়া-অমিয়র দাম্পত্য সম্পর্ক অন্য পথ নেয়।

আমরা জানি, শরীরের আকর্ষণ সাময়িক কিন্তু মনের টান চিরন্তন। কাজেই, ধীরে ধীরে মনোতোষ এবং অমিয়র মধ্যেকার তুলনাটা জয়ার কাছে আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তার মন বার বার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে তার সম্মানে বাধে। তার মনের ভাব লেখকের বর্ণনায় এইভাবে উঠে আসে –"চিন্তার জট কেবল জড়ায়। কিন্তু সব জট সব জাল ছিঁড়তে পারত অমিয়! সে যদি এসে সামনে দাঁড়াত, যদি ধরত এসে হাত, জয়া তার মুখের দিকে হয়তো তাকাতে পারত না, কিন্তু বুকের মধ্যে লুকাতে পারত। বলতে পারত, আমার সব লজ্জা তুমি ঢেকে দাও, আমার সব কলঙ্ক আবৃত করে রাখো।"[৫০] আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় যে, এ হল একটি হৃদয়ের প্রতি আর একটি হৃদয়ের অকৃত্রিম ও গভীরতর আকর্ষণ। অপরদিকে অমিয়র মনেও স্ত্রীর প্রতি তীব্র অভিমান জমা হয়। উভয়ের মনের এই মান-অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির পাহাড় জমতে জমতে দুটি সত্তা যেন আড়ালে চলে যায়। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্কও একসময় ছিন্ন হয়ে যায়। তবে আইনগত দিক থেকে এই দুটি মানুষ পৃথক হয়ে গেলেও 'দুটি মন' অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যার বন্ধন চিরন্তন ও শাশ্বত। কাজেই, আমরা লক্ষ করি – অমিয় যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী তখন সেই সংবাদে জয়া বিচলিত হয়ে ওঠে। সমস্ত মান-অভিমান, অহংবোধ ও যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে সে স্বামীর কাছে ছুটে আসে। যথার্থ 'সঙ্গিনী' হিসাবে জয়া অমিয়র পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের হারানো সম্পর্ককে ভিন্নমাত্রায় আবার তারা ফিরে পায়।

এইভাবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আলোচ্য উপন্যাসে উক্ত দুই দম্পতির সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরতে মনোতোষ ও জয়ার মধ্যেকার একটি সম্পর্কের যে আবহ তৈরী করেছেন, তাতে মনোতোষ চরিত্রটিও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বাভাবিক আচরণ করেছে। শারীরিক মিলনের মাধ্যমেই জয়ার প্রতি তার একরকম অধিকারবোধ জেগে ওঠে। সে জানে, জয়া তাকে ভালোবাসে না। শুধুমাত্র করুণা করে এবং মানবিকতার খাতিরেই তার কাছে সে থেকে গিয়েছে। তাই ঐ মানুষটিকে বাঁধতে মনোতোষ কখনো সমাজের প্রচলিত রীতি অর্থাৎ বৈবাহিক-সূত্রকে গ্রহণ করতে চেয়েছে আবার কখনো বা আপন ঔরষজাত সন্তানের জননী হিসাবে জয়াকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। কিন্তু তার অন্তর্লোককে স্পর্শ করতে পারেনি। মানব-মানবীর বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের আর একটি দিক এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা কীভাবে জীবন ও সম্পর্কগুলোকে নতুন করে চেনাতে সাহায্য করে; কেমন করে 'জীবন' আরও নতুন পাঠ দান করতে করতে এগিয়ে চলে, তারই দৃষ্টান্ত লেখকের **'শুক্লপক্ষ'** উপন্যাসটি। 'শুক্লপক্ষ' বলতে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সময়পর্বকে বোঝায়। এই বিষয়টিকে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র আলোচ্য উপন্যাসে ঠিক কোন্ ব্যঞ্জনায় ভূষিত করেছেন তা দেখে নেওয়া যাক।

এই উপন্যাসে ভিন্ন দুই সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীর মধ্যেকার সম্পর্কের ধারাকে প্রতিকায়িত করবার উদ্দেশ্যে লেখক সমান্তরালভাবে অজস্র চরিত্র ও সম্পর্কের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রথমে মূল অংশের আলোচনার আগে আমাদের দেশভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার সামাজিক অবস্থা আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কারণে তৎকালীন পল্লী-বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর একত্রে বসবাস করবার প্রেক্ষাপটটিকে লেখক এখানে বিশেষ অর্থে উপস্থাপিত করেছেন। সেখানে দেখা যায় – কাহিনীর প্রধান চরিত্র সেবা একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। অপরদিকে প্রতিবেশী মুসলমান পাড়ার বৃদ্ধ আতাহার সিকদার। একদা অবস্থাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী থাকলেও, মামলা-মোকদ্দমায় তার বিষয়-সম্পত্তি বর্তমানে প্রায় নিঃশেষিত। তিনি প্রথম থেকেই তার মামলা-মোকদ্দমায় সেবার বাবাকে সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করতেন। পরিবর্তে আতাহার মিঞা দুধের ও রসের হাঁড়ি এই দরিদ্র পরিবারে পাঠিয়ে দিতেন। অর্থাৎ এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। তৎকালীন গ্রামবাংলার রীতি-রেওয়াজে এই বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল। তা লেখক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দু'জন নর-নারীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাই লক্ষ করা যায় – বৃদ্ধ আতাহারের একমাত্র সুদর্শন মেধাবী পুত্র আতিকরের বিশেষ সমাদর ছিল সেবা দের পরিবারের কাছে। সেই সূত্র ধরেই আতিকর ও সেবা শৈশব থেকেই একত্রে বেড়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, একজন ছেলের প্রতি একটি মেয়ের বা বিপরীতভাবে বলা যায়, একটি মেয়ের প্রতি একজন ছেলের যে প্রবৃত্তিগত স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে; তা বোধ হয় এই স্ত রে গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গগত আকর্ষণের বোধ এই শৈশব বয়সে জন্ম নেয় না। এই পর্বে ছেলে-মেয়েরা খেলা-ধূলা অথবা পড়াশুনার সঙ্গী হিসাবেই পরস্পরকে গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সেবা ও আতিকরের মধ্যেও তা-ই ছিল। কিন্তু আমরা জানি, একটা সময় থেকে ছেলে ও

মেয়ে উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। এর চূড়ান্তরূপ যে সময়পর্বে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে 'বয়ঃসন্ধি' কাল বলে চিহ্নিত করা হয়, যা প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। অর্থাৎ এই স্তরে নানা পরিবর্তনকে সঙ্গী করে মানুষ শৈশবত্ব ঘুচিয়ে কৈশোর জীবনের শুভ সূচনা করে। এখান থেকেই মানুষের সেই অর্থে চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয়। এই সময় চরিত্রসমূহের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তা হল – আত্মসচেতনতা তথা আপন অস্তিত্বকে সকলের কাছে জানান দেওয়ার প্রবণতা, যাকে কেন্দ্র করেই মনের কোণে বহুবিধ কামনা-বাসনা জন্ম নেয়। আর তা পূরণের ক্ষেত্রে শরীরও নানা ইঙ্গিত প্রেরণ করে থাকে। এখান থেকেই বিপরীত পক্ষের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে। মন সমস্তরকম বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে নতুন কিছু করবার প্রয়াসে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

এই দিকগুলি সময়ের তালে তালে আতিকরের চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। কাহিনীধারা থেকে উঠে আসে – গাঁয়ের এম.ই. স্কুল থেকে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পেয়ে আতিকর যখন হাইস্কুলে যায় তখন তার বয়স ষোল-সতেরো বছর। অপরদিকে সেবার বয়স দশ-এগারো বছর। অর্থাৎ এই দুটি সত্তা সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছে। তাদের মধ্যে ছয়-সাত বছর বয়সের পার্থক্য ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক আগেই বয়ঃসন্ধির আগমন ঘটে। সুতরাং এই পর্বে মেধাবী ছাত্র হওয়ার সুবাদে সেবাকে অঙ্ক কষানো বা অন্যান্য অজুহাতে বদ্ধ বারান্দায় যখন এই দুটি চরিত্র অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাত তখন উভয়েই উভয়ের রূপ-যৌবনের প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছিল, তা আমরা পাঠকেরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি। তবে পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণ সম্পর্কে তারা দুজনেই জ্ঞাত ছিল। তার প্রমাণ ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় ধরা পড়ে – সেবার মা আতিকরকে 'সোনাদা' বলে ডাকবার জন্য সেবাকে পরামর্শ দিলেও –"কিন্তু সেবা তা মোটেই ডাকত না। আতিকরদা বলত। আর ওর মনের দুর্বলতা টের পেয়ে সোনা মিঞা বলে ঠাট্টা করত।"[৫১] তবে দু'জনের মনের এই দুর্বলতা পরিবারের বড়দের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কেননা, জীবন-সম্পর্কে তারা ছিল অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাই সেবার ঠাকুরমার কণ্ঠে আদেশের সুর ধ্বনিত হয় – "বউমা তোমার মেয়ে এখন বড় হয়েছে। ও যেন যখন-তখন যেমন-তেমনভাবে আতিকরের সামনে আর না বেরোয়। ভিন্ন জাত ভিন্ন ধর্ম। ছি ছি ছি, পাড়ায় লোকে এরই মধ্যে গা-টেপাটেপি শুরু করেছে। নিজের মেয়েকে তুমি যতখানি কচি খুকি বলে ভাবো, লোকে তা ভাবে না। ও কি কম ধিঙ্গি হয়েছে নাকি ? বিয়ে দিলে যে এতদিনে ছেলের মা হয়ে যেত।"[৫২] সুতরাং সেবার মা তার

শাশুড়ির কথা বিবেচনা করে আতিকরের সামনে মেয়ের বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে লক্ষ করা যায় – আতিকর নানা অজুহাতে সেবাদের বাড়িতে আসে। এবং তার চোখ শুধুমাত্র একজনকেই খুঁজে ফেরে। আর তা লক্ষ করে সেবার ঠাকুরমা যখন আড়াল থেকে বলতে থাকে – "চোখ তো নয়,যেন চোরের চোখ। কেমন টালুমালু তাকায় দেখো।"[৫৩] তখন আমরা দেখি, একথায় সেবা আহত হয়। এই বয়সে সমস্ত বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করবার তীব্র প্রবণতা সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নতুন কিছু প্রয়াস সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। আর এই বিষয়টিকে আরও ত্বরান্বিত করবার উদ্দেশ্যে লেখক দেশবিভাগ ও তার পরবর্তী অস্থির সমাজ পরিস্থিতিকে এই স্তরে উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে দেখা যায়, আতিকরের বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু ঘটে। ফলস্বরূপ উক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আতিকরের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায় – একদা মেধাবী ছাত্র আতিকর ম্যাট্রিকুলেশনে কোনও রকমে সেকেণ্ড ডিভিশন পায়। গাঁয়ের ও গঞ্জের খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, বিড়ি-সিগারেট খায়, দশ আনি ছ'আনি চুল ছাঁটে। প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী এই যুবকটি বর্তমানে সাম্প্রদায়িক গুন্ডাদলের বড় একজন পাণ্ডা। তার এমন অধঃপতনে মা সাকিনা বেগম কখনো শাসন করেন কখনো বা অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মায়ের প্রতি আতিকরের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়েই তার চরিত্রের চূড়ান্ত অবনতির দিকটি ধরা পড়ে এইভাবে – "তোমার যদি এখানে থাকতে ভালো না লাগে, মনের মানুষ খুঁজে নিয়ে নিকে বসলেই পারো।"[৫৪] কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে – আতিকর তার বাবার মতোই কুচক্রী বদমাশ ও শয়তান হলেও বাবার শক্তি সামর্থ্য ঐশ্বর্য কিছুই পায়নি। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, ঔপন্যাসিক কাহিনীর প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবেই আতিকর চরিত্রটিকে 'বাঘের বাচ্চা বাগডাশ' রূপে চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ আতিকর সাম্প্রদায়িক গুন্ডাদলের সদস্য হলেও সেই দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত তার শৌর্য-বীর্য-শক্তি-ঐশ্বর্যের অভাব ছিল। তবে নব-সঞ্চারিত মতাদর্শকে (হিন্দুবিরোধী মনোভাব) প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আপন সত্তার কাম-বাসনা নিবারণের মত্ততায় বশবর্তী হয়ে সে গুন্ডাদের সঙ্গী করে সেবাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই প্রথম এমন একটি বিষয় নিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেছেন যেখানে ভালোলাগার পাত্রীকে একজন পুরুষ ধর্ষণ করতেও পারে! অর্থাৎ দেহাতীত প্রেম নয়, যৌন আকাঙ্ক্ষাকেই আতিকর এখানে প্রাধান্য দিয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে আসে প্রেমের গাঢ়তা সেখানে কতখানি ছিল বা আদৌ কী সেখানে প্রেম জন্ম নিয়েছিল ? আর তা যদি না হয়, তাহলে কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ মানসিকতায় এমন একটা ঘটনা ঘটানো সম্ভব

হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দু'জন নর-নারীর সম্পর্কই বা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয় – তার সমীকরণ হয়তো এই লেখকের কলমেই এমন সহজভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব।

আসলে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার প্রভাব আতিকর চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সেবার সহজ-সাধারণ জীবন যেন হঠাৎ এক কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে তছ্নছ্ হয়ে যায়। তার জীবন স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে। এই দুর্ঘটনার পর সমাজ সেবাকে কীভাবে গ্রহণ করবে, তা বোধহয়, আমরা খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি। সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সেবার 'ঠাকুরমা' চরিত্রটিকে কথাকার এখানে আবার ব্যবহার করেছেন। তাই দেখা যায়, ঐ ঘটনার পর সেবা নিজেদের বাড়ির ইঁদারা থেকে জল তুলতে গেলে ঠাকুরমা তরুবালা ছুটে এসে হাত চেপে ধরে জানায় – "এই হতচ্ছাড়ি, জাত-জন্ম খোয়ানো বদমাশ মেয়ে! আমার ইঁদারার জল নষ্ট করলি কোন্ সাহসে ? সরে যা, সরে যা।..... ও জল আমার দেবতার পুজোয় লাগে। খবরদার, ও জল তুই নষ্ট করবিনে, আমার ইঁদারায় তুই হাত দিবিনে।"[৫৫] একটি ঘটনা যেন এক লহমায় সেবার বয়সকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। অপ্রত্যাশিত এমন অবাঞ্ছিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ভারে তার জীবন নুয়ে পড়ে। গুন্ডার দল তার শরীরকে ধর্ষণ করেছিল ঠিকই কিন্তু সমাজের কাছে সেবা প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে ধর্ষিত হয়ে চলে। কেননা, সমাজ এই ঘটনাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে। তাদের ধারণা সেবা আতিকরকে ভালোবাসত বলেই তার সঙ্গে চলে যায় এবং ফিরে এসে ডাকাতির গল্প ফাঁদে। সুতরাং সকলের কুটিল দৃষ্টির বর্ষণে সে ক্লান্ত। সেবা এসব যত ভুলে থাকতে চায়, সমাজ তত বারবার তার 'নষ্ট হয়ে যাওয়া' -কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বলতে হয়, জীবনের এই যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেই সেবা বাধ্য হয়ে মামার কাছে লেখা মায়ের চিঠিতে নিজের আর্তি যুক্ত করে দেয় – "বড়মামা, আপনার পায়ে পড়ি। বেশিদিনের জন্যে না হোক, এক মাসের জন্যে অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে আমাকে আশ্রয় দিন। আমার বড় বিপদ। এক সপ্তাহ পরে আমার নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব। ইতি হতভাগিনী সেবা।"[৫৬] অর্থাৎ এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে সেবা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি লাভের মধ্য দিয়ে জীবনের একটা পথ খুঁজতে চেয়েছিল সে। অপরদিকে তার এই চিঠির সূত্র ধরেই আর একটি দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

একটি বৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ দু'জন নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি নানাবিধ চাওয়া-পাওয়া থাকে। কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকে বাহ্যিক তথা বৈষয়িক আর কিছু থাকে অন্তরের।

বৈষয়িক বা মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণতা পায়, কখনো পায় না। আর এই অপূর্ণতাকে ঘিরেই নানা জটিলতার বাতাবরণ তৈরী হয়। তা থেকে সম্পর্কও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এ সব কিছুকে মেনে নিয়েই সেই বৈধ সম্পর্কে থেকে যায়। তবে মনের কারখানা ক্রমশ আলোড়িত হতে থাকে। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার একটা অভিনয় চলতে থাকে। আবার কেউ এই সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে বেরিয়ে আসতেও সক্ষম হয়। আলোচ্য উপন্যাসে সেবার জীবনের এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে তাকে গ্রাম-বাংলার সামাজিক পরিবেশ থেকে নাগরিক সভ্যতায় স্থানান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে, কথাকার সেবার দূর-সম্পর্কের এক মামা-মামীর দাম্পত্য জীবনকে বিশেষভাবে চিত্রিত করেছেন। সেখানে দেখা যায় – শৈলেন্দ্রনাথ এবং নীরজা -এই দু'জন স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন রুচি-আদর্শে গড়া। পরিমার্জিত রুচি ও শান্ত সৌম্য প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী শৈলেন্দ্রনাথ অন্তরের সৌন্দর্যে বিশ্বাসী। বাইরের আড়ম্বর, বিলাসবহুলতা নয়, হৃদয় সৌন্দর্যের আলোকে অপূর্ণতাকে তিনি পূর্ণ করবার প্রয়াসী। অপরদিকে স্ত্রী নীরজার কাছে অন্তরজগৎ নয়, তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের প্রাচুর্য, বর্ণাঢ্যতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র, বিলাসিতার নানা উপকরণের চাহিদা মেটানোকেই জীবন বলে মনে করেন। অর্থাৎ মতাদর্শের বিস্তর পার্থক্য তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। লক্ষ করা যায়, শৈলেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে কিশোরী স্ত্রীর চাহিদাগুলিকে অস্বীকার করে তিনি নিজের মত করে তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেখানেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। নীরজাদেবী স্বামীর মতাদর্শকে গ্রহণ করেননি, বরং এর তীব্র প্রতিবাদ করে নিজের মতাদর্শেই তিনি স্থির থেকেছেন। ফলে দুটি মনের তীব্র অশান্তি সপ্তমে পৌঁছোয়। প্রতিক্রিয়ায় শৈলেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসেননি, নিঃশব্দে অবজ্ঞা করেছেন, বড় জোর অনুকম্পা করেছেন। বদলাতে না পেরে বারবার আঘাত করেছেন অপ্রীতি অপ্রেম এবং অসহযোগিতার ভিতর দিয়ে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের ঘেরাটোপে অনায়াসে দুটি বিপক্ষ শিবির গড়ে ওঠে। সর্বদা সেখানে যুদ্ধের সাইরেন বাজতে থাকে। তবে দেখা যায়, শৈলেন্দ্রনাথ অবিরত এই বিরুদ্ধাচরণে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ওঠেন এবং পরাজয় মেনে নিয়ে 'নীরবতা'কে হাতিয়ার করে বিপক্ষ মানুষটির কাছ থেকে মানসিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকেন।

এমত পরিস্থিতিতে যখন সন্তানরা পৃথিবীতে আসে তখন খুব স্বভাবিকভাবেই নীরজাদেবী সন্তানদের তার পক্ষে টেনে নেন। যা ছিল তার কাছে স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার একটা পন্থা। স্বামীকে তিনি যা দিতে পারেননি, সন্তানদের তা উজাড় করে দেন। নিজের রুচি ও পছন্দমত তাদের তিনি গড়ে তুললেন। বর্ণাঢ্য বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের সমস্ত রূপ-রস-

গন্ধকে ভোগ করবার সুযোগ ছেলে-মেয়েদেরকে তিনি করে দেন। তবে এক্ষেত্রেও নীরজাদেবী সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কেননা, মেয়ে বীথিকা ও ছেলে জয়ন্ত সংযমহীন ভোগবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে হতে তারা জীবনে শৃঙ্খলাহীন ও ব্যাভিচারী হয়ে ওঠে। তারাও নীরজার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বিশেষত, মেয়ে বীথিকা যে এমন সংযমহীন 'লাইফ স্টাইল'-এ অভ্যস্ত, যার জীবন-বোধ উক্ত জীবন সাপেক্ষেই গড়ে উঠেছে, সে যখন দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে তখন সেখানেও স্বামীর সঙ্গে তার মতের মিল ঘটেনি। কাজেই সেই সম্পর্ককে ছিন্ন করে এসে সে অভিনয় জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। এ বিষয়ে বলা যায়, নীরজাদেবী সংঘাত, মত-পার্থক্য, অপ্রীতিকে মেনে নিয়েও সম্পর্কে থেকে যান কিন্তু বাঁধনহীন জীবনে বিশ্বাসী বীথিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে সম্পর্কের বন্ধনকে অস্বীকার করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে শৈলেন্দ্রনাথ পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা তার বাইরে চলাফেরা করার অপটুতা, খাবার-দাবারের বাছবিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তারা যখন সেই পরিকল্পনাকে বরখাস্ত করেছে তখন যেন তিনি নতুন করে আন্তরিকতা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি একবিন্দু রসের সন্ধান পেয়েছেন যা তার মনের কোণে পুনরায় আশা সঞ্চার করেছে যে, বোধ হয় এবার সমস্ত বিদ্বেষ, বিরোধিতার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারবেন। এই লোভটুকুই তাঁকে বন্ধনে জড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, একটি সম্পর্কে যতই মতাদর্শের পার্থক্য থাকুক না কেন তাতে বিশেষ হৃদয়াবেগ জড়িয়ে থাকে। সেই আবেগটুকুই দু'জন নর-নারীকে একটি অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখে। এর দ্বারাই সম্পর্ক বেঁচে থাকে, সমাজ টিকে থাকে এবং সভ্যতা এগিয়ে চলে। তবে দেখা যায়, সেবাও এই পরিবারে এসে দুটি বিপক্ষ শিবিরকে অনুধাবন করতে পারে এবং দুই পক্ষেরই মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। লক্ষণীয়, পল্লীবাংলার সমাজ সেবাকে এক কঠিন অভিজ্ঞতা প্রদান করে অপরদিকে নাগরিক সভ্যতায় একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই ছোট সংসারের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি তার জীবনকে আর এক নতুন পাঠে দীক্ষিত করে। তাই সে জীবনের এই পর্বে এসে আর্থিক স্বাবলম্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনের এক পথ খুঁজতে চেয়েছিল।

কাহিনীর ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, সেবার জন্য দু'শো টাকার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় বীথিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিপত্নীক শুভেন্দুবাবু। সে বীথিকার মতই ভোগবাদে বিশ্বাসী। চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় তার প্রতি সেবার কৃতজ্ঞতা ছিল। শুভেন্দুবাবু সেই কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যখন সেবার হাত ধরে তখন মুহূর্তে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, দেশহীন কালহীন

এক অন্ধকার ঘরে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। তবে সেবা পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নেয়। কোন তীব্র প্রতিবাদ সে করতে পারে না ঠিকই কিন্তু তার মনে হয়তো জেগে ওঠে গ্রাম কিংবা শহর, স্বধর্ম অথবা পরধর্ম যাই হোক না কেন, আসলে সকল পুরুষই সমান। নারীদেহই তাদের প্রধান লক্ষবস্তু। সেই সঙ্গে তার এ বোধও জাগে – তার মত ধর্ষিতা বা 'নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে'-এর হাত বোধহয় খুব সহজেই ধরা যায়। ঘটনাক্রমে দেখা যায়, বীথিকার ঘরে সেবা ও শুভেন্দুকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে উভয়ের প্রতি চরম ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বীথিকার মনে স্বভাবিকভাবেই জেগে ওঠে। বিশেষত বীথিকা সেবাকেই ভুল বোঝে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেবা অনুভব করে – বীথিকা নিজেকে যতই স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল বলে মনে করুক না কেন আসলে সে ভীষণ অসহায়। তার একাকীত্ব জীবনে একমাত্র সহায় শুভেন্দু। শুভেন্দুকে ছাড়া বীথিকার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সেবা বীথিকার ভুল ভেঙে দিয়ে শুভেন্দুকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়। কেননা, এক তিক্ত অভিজ্ঞতা তার স্বাভাবিক জীবনকে এলোমেলো করে দিয়ে গেলেও সেবারও রুচি-সংস্কার এবং আত্মসম্মানবোধ আছে। আর তা সে প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি –"আমাকে তুমি কী ভেবেছ বলো তো বীথিদি ? আমাকে জোর করে একবার ডাকাতে নিয়ে গিয়েছিল বলে, মাস তিনেক তারা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল বলে তুমি কি ভেবেছ সত্যিই আমার জাতজন্ম গেছে, রুচি প্রবৃত্তি সব আমি ধুয়ে মুছে ফেলেছি ? কানা নেই, খোঁড়া নেই, মাতাল নেই, লম্পট নেই যাকে দেখব তাকেই ভালোবাসব ?" [৫৭]

লক্ষণীয়, এই আত্মসম্মানকে সঙ্গী করেই সেবা যখন তার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার উদ্যোগ নেয় তখন সেবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত আতিকরের মায়ের একখানা চিঠি শুধুমাত্র সেবার জীবন নয়, সমগ্র কাহিনীর গতিমুখকে ভিন্ন পথে চালিত করে। 'চেনামহল' উপন্যাসের মত এই শেষপর্বে কাহিনীতে চিঠিটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আতিকর বয়সোচিত উত্তেজনায় কিংবা বিশেষ মতাদর্শের প্রেরণায় সেবাকে ধর্ষণ করলেও ঐ ঘটনার পর তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সে নিজ কৃতকর্মের অনুশোচনা করে এবং অপরাধবোধে ভোগে। আর এই কারণেই হয়তো আমরা যদি কাহিনীধারার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ফিরে যাই তাহলে দেখি আতিকর নিজেকে সহ অন্যান্য সঙ্গীদেরও পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। তার সেই অপরাধবোধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তা ঘুচাবার মত কোনও উপায় আতিকরের কাছে ছিল না। তাই দেখা যায়, মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের কাছে শেষ বেলায় কাকে দেখতে চায় তা জানতে চেয়ে মা সাকিলা বেগম যখন একে একে সকল আত্মীয় পরিজনদের নাম করেছেন তখনও আতিকর মাথা নত করে

রয়েছে। তবে সন্তান আসলে কাকে দেখতে চায় মা তা অনুভব করতে পেরেছেন। যা সেবাকে লেখা চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে –"তবু তাকে রোজ বলি – এনে দেব। ছেলেবেলায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে কাঁদত। তখনও তাকে বলতাম – এনে দেব, এনে দেব। আজ তার যাবার বেলায়ও তাই বলি।

তুমি কি আমার মুখ রাখবে মা ? ইতি

চিরদুঃখিনী
সাকিলা বেগম"[৫৮]

এতদিন বাদে আতিকরের মায়ের এই আকূতি এবং আতিকরের কৃতকর্মের অনুশোচনা করবার সংবাদে সেবার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, দ্বিতীয়বার চিঠিটি পড়তে গেলে তার আগেই চোখের জলে অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায়। এখানেই লেখক কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন। তবে আমরা জানি এখানেই শেষ হতে পারে না। এরপর সেবা কী আতিকরের মায়ের মুখ রাখবে ? কিংবা আতিকরকে ক্ষমা করে, সে যতদিন এই পৃথিবীতে আছে তাকে নিয়ে তাদের সম্পর্ক কী নতুন ভাবে সূচিত হবে ? না কি শেষ পর্যন্ত সেবা-ই জয়লাভ করেছে বা আতিকরের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে – এই অনুভূতিটুকুকে পাথেয় করেই সেবা বাকীটা জীবন কাটিয়ে দেবে ? এরকম নানা প্রশ্ন রয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় – যেহেতু উপন্যাসের নাম 'শুক্লপক্ষ' সেহেতু এখানে অন্ধকার থেকে আলোর পথে অর্থাৎ একটি ইতিবাচক দিকের ইঙ্গিতকেই বহন করে চলে।

এরকম একটি জটিল পরিস্থিতি রচনা করে মানব সম্পর্কের আর একটি স্তরকে যেভাবে কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এখানে উন্মোচিত করেছেন তা আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে, নতুন করে ভাবতে শেখায়। শেষ পর্বে এসে সেবার মনে যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের উৎসরণ ঘটে তা যেন শুধুমাত্র সেবারই নয়, আমাদেরও। কেন্দ্রিয় দুই চরিত্রের হৃদয়লোকে যে অব্যক্ত অনুরণন জাগরিত হয়েছিল তা আমাদের পাঠককুলের হৃদয়েও ধ্বনিত হয়েছে। এখানেই কথাশিল্পীর সার্থকতা।

মানবজীবন সর্বদা চেনা ছকে বয়ে চলে না। বরং তা ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের নতুন নতুন পাঠে দীক্ষিত করে তা চলতে থাকে। জীবনের গতি পথেই নানা রকম সম্পর্কের জন্ম নেয় এবং সেগুলি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই বাহিত হতে থাকে। সুতরাং বলা যায়, জীবনের চলমানতার সঙ্গে সম্পর্কের প্রবাহমানতা গভীরভাবে

নির্ভরশীল। কাজেই, একটি সম্পর্কে যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের আগমন ঘটবে তা খুব স্বাভাবিক। সমাজের প্রচলিত পন্থা অনুযায়ী দু'জন যুবক-যুবতীর সম্পর্ক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে, তা কতভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং এতে কত বিচিত্র রূপের সমাবেশ ঘটে থাকে – তারই একটি দিক লেখক তাঁর **'কন্যাকুমারী'** (১৯৫৭) নামাঙ্কিত উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন।

আমরা জানি, একটা বয়সে এসে শ্রবণ ও দর্শন জনিত কারণে দু'জন যুবক-যুবতীর মধ্যে পূর্বরাগের বাতাবরণ তৈরী হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ যা গভীর ও বিস্তৃত হতে থাকে। এই উপন্যাসেও লেখক দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের মধ্যে পূর্বরাগ গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় মাধ্যম হিসাবে নায়কের পরিবারকে ব্যবহার করেছেন। সে প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা বুঝে নেব আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় দু'জন নারী-পুরুষ সমাজের কোন্ বৃত্তের অন্তর্গত অর্থাৎ তাদের সামাজিক অবস্থান কোথায় কিংবা তাদের পারিবারিক কাঠামো ও পরিবেশ-পরিমণ্ডল-ই বা কেমন। কারণ যুগ-কালের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়। সেই অনুযায়ী চরিত্রগুলি আচার-আচরণ করে। আর স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়ে তাদের সম্পর্কে।

কাহিনীর ধারাবাহিকতায় উঠে আসে প্রধান দু'জন যুবক-যুবতী অর্থাৎ সুকুমার ও শীলা উভয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত হলেও সুকুমারদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল। সেই তুলনায় শীলাদের পরিবারে অভাব ও অর্থসংকট ছিল নিত্যসঙ্গী। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র দাদা অজিতের উপর ন্যস্ত হলে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী শীলা তার বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী ম্যাট্রিকুলেশনে পড়াকালীন সময় থেকে দু'বেলা দুটি টিউশনি করে দাদার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। ফলে কিশোরী বয়সেই শীলা অনেকবেশি পরিণত, মার্জিত ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হওয়ায় স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সহ সকল শিক্ষিকাই তাকে স্নেহ করেছেন ও ভালোবেসেছেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, জীবন অভিজ্ঞতাই শীলার এমন ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করেছিল। দেখা যায়, বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে সুকুমারের মা বিমলপ্রভার বিশেষ পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে শীলার আলাপ-পরিচয় হয়। একরকম সহানুভূতি ও ভালোলাগার জায়গা থেকেই তিনি তার দুই মেয়ের জন্য শীলাকে টিউটর হিসাবে নিযুক্ত করেন। কাজেই সেই সুবাদে শীলা সুকুমারদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল বলে খুব সহজেই এই দু'জন যুবক-যুবতীর মধ্যে পূর্বরাগের বাতাবরণ তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও সুকুমার কর্মসূত্রে শহরের বাইরেই থাকত তবুও তার সঙ্গে মা ও বোনদের পত্র বিনিময় চলত। এই

'পরোক্ষ মাধ্যম'-এর দ্বারাই প্রাথমিক পর্যায়ে শীলা ও সুকুমার পরস্পরকে অনুভব করবার চেষ্টা করে এবং ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের মধ্যে পত্র আদান-প্রদান হতে থাকলে সেই অনুভব আরও গভীরে পৌঁছোয়। একসময় সুকুমার বদলি নিয়ে নিজের শহরে চলে এলে তাদের মধ্যেকার সেই সম্পর্ক উভয়ের হৃদয়রসের দ্বারা লালিত হতে থাকে।

এইভাবে কাহিনীতে উক্ত দু'জন নর-নারীকে ঘিরে যে সম্পর্ক সূচিত হয়েছিল তা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। একটি সম্পর্কে যখন দু'জন মানুষ আবদ্ধ হয় তখন সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানাবিধ স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পরস্পরেরই মনের কোণে এসে ভিড় করে। দেখা যায়, শীলার কল্পনার জগতে ভেসে ওঠে সে কীভাবে এই পরিবার-সংসারকে নিজের মত করে নতুন করে সাজিয়ে তুলবে। শুধু শীলা নয়, সুকুমারের কল্পনাতেও নানা পরিকল্পনা ধরা দিয়েছে। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সেও আবার এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে, সেই শিক্ষালাভের যৌথ প্রচেষ্টার কথা মনে করে সুকুমারও শিহরিত হয়েছে। অপরদিকে শীলার কাছে সংসার বলতে একটি একান্নবর্তী পরিবারের-ই চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক্ষেত্রে তার মন যেভাবে কল্পনার জাল বুনেছে –"সংসার মানেই একটি একান্নবর্তী পরিবারের কথা তার মনে পড়েছে। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ, আত্মীয়-পরিজনে ঘেরা বেশ একটি বড় পরিবার। সেই ভিড়ের মধ্যে তারা নিজেরা নিজেদের খুঁজে পাবে। না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসার যেন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। যেন একটা পুরো সংসার নয়, একখানা বড় অভিমানের অতি ছোট সংক্ষিপ্ত পকেট সংস্করণ।"[৫৯] সুতরাং বলা যায়, সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে চলা ও সকলের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা ও মানসিকতা শীলার মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই কাজ করেছিল। সহমর্মিতা তথা দরদী মনোভাব তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে, নর-নারীর মনের এই চাহিদাগুলি পূরণ করবার জন্য সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। আমাদের সমাজে 'বৈবাহিক বন্ধন' হল সেই স্বীকৃতির প্রচলিত একক। সেই সূত্রেই দেখা যায়, দুই পরিবারের যৌথ উদ্যোগে শীলা ও সুকুমারের বিবাহ আগামী সতেরোই ফাল্গুন ঠিক করা হয়। কাজেই, এই আগত দিনটিকে ঘিরে যে দু'জনের মনেই বিশেষ উত্তেজনা কাজ করবে তা খুব স্বভাবিক। আসলে প্রাক্‌বিবাহ পর্বের প্রত্যেকটি নর-নারীর মনেই বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা ও স্বপ্ন থাকে। শীলা ও সুকুমারের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়।

তবে জীবন কখনো চেনা ছকে এগিয়ে যায় না। তার হিসাব আলাদা, তা আপন খেয়ালে বয়ে চলে। আর তার উপরেই ভীষণভাবে নির্ভর করে থাকে আমাদের এই মানব-সম্পর্ক।

এই সূত্রেই শীলা ও সুকুমারের তিন বছরের সম্পর্কে এক বিশেষ পরিস্থিতির উপস্থিতি ঘটে। যার প্রতিক্রিয়ায় তাদের সম্পর্ক ভিন্ন পথে বাক্ নেয়। ফলে তাতে রূপ বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটে। লক্ষ করা যায় – বোনের বিয়ে উপলক্ষে কিছু টাকা অগ্রিম সংগ্রহ করতে গিয়ে অজিত কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে তার চাকরি হারায়। এমন অবস্থায় অন্য কোথাও থেকে টাকা ঋণ করে কিংবা শুধুমাত্র রেজিষ্ট্রির মাধ্যমেও শীলার বিয়ে হতে পারত। বিয়ের পর সচ্ছল শ্বশুরবাড়িতে শীলাও সুখে থাকত। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে, পরিবারের আট-দশটি পোষ্যকে রেখে শীলার মতো মানসিকতার মেয়ে যে শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবতে পারে না তা আমরা পাঠকরা সকলেই নিশ্চিত। তাই দেখা যায় – শীলা এবারও দাদার পাশে এসেই দাঁড়ায়। বিয়ের তারিখটি পরিবর্তন করবার সিদ্ধান্ত নেয় শীলা। অন্যদিকে সুকুমার ঐ নির্দিষ্ট দিনটিকে ঘিরে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সুতরাং সে যে আকস্মিক এই সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না তা খুব স্বাভাবিক। কাজেই এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শীলা যখন জানায় – যেহেতু ব্যাপারটা দু'জনের সেহেতু দু'জনের সুবিধা-অসুবিধার কথাই ভেবে দেখতে হবে। তখন এর উত্তরে সুকুমার বলে – "একথা তুমি মুখে বলছ বটে কিন্তু আসলে তোমার মনের ইচ্ছে আমরাই শুধু তোমাদের পরিবারের সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবব, আর তোমরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।"[৬০] কেবল তাই নয়, বিয়ের চিঠি বিলি হয়ে যাওয়ায় সুকুমার পরিবারের মান-সম্মানের বিষয়ে প্রশ্ন তুললে শীলা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয় –"মান-সম্মান? আমাদের যেখানে জীবন ধারণের প্রশ্ন, সেখানে মিথ্যে মান-সম্মানের কথাটাই তোমার কাছে এত বড় মনে হল?"[৬১] অর্থাৎ বিয়ের তারিখ পরিবর্তন করবার বিষয়কে নিয়েই তাদের মধ্যে এই প্রথম মনোমালিন্য হয় এবং তা থেকেই উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্বও সৃষ্টি হতে থাকে। শীলা যদিও তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে জানায় – তার দাদার একটা চাকরির ব্যবস্থা হলেই সে বিয়ে করবে। তার এই ভাবনা যেন সুকুমারের মনে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই মনের তীব্র ক্ষোভ ও অভিমান তার কণ্ঠে ধরা দেয় – "বেশ কথা। কিন্তু বিয়ে তো শুধু তোমার ইচ্ছাতেই হবে না। এ ব্যাপারে আরও একজনের ইচ্ছে-অনিচ্ছেও আছে।"[৬২] কাজেই এই পর্বে এসে দু'জনের, বিশেষত, সুকুমারের মনে হয় – "কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছে। এতদিন তারা পরস্পরের যে পরিচয় পেয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে তার সবটুকুই সত্য নয়, খাঁটি নয়। তাদের ভালোবাসার মধ্যে অনেক খাদ মেশানো রয়েছে।"[৬৩] প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এরকম পরিস্থিতিতে সুকুমারের মনে দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ জমে ওঠাটা স্বাভাবিক ছিল।

আর তা আরও বেশি ঘনীভূত হয়ে ওঠে পরিবারের কথা ভেবে শীলা একটি অফিসে কাজে যুক্ত হলে। রক্ষণশীল মনোভাব অথবা অধিকারবোধের জায়গা থেকে যাই হোক না কেন, শীলার চাকরি করবার বিষয়টি সুকুমার ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। আসলে প্রত্যেকটি মানুষ-ই তার ভালোলাগার পাত্র বা পাত্রীকে আগলে রাখতে চায়। হারিয়ে ফেলবার একটি ভয় সবসময় তার মধ্যে কাজ করে। সুকুমারের মধ্যেও এই দিকটি পরিলক্ষিত হয়। তাই দেখা যায় – সুকুমারের মা বিমলপ্রভা দেবী ছেলে শীলার কোন খোঁজখবর নিয়েছে কিনা তা জানতে চেয়ে তিনি যখন বলেন – শীলা না হয় নতুন চাকরি পেয়েছে, নতুন মানুষ তো আর পায়নি তখন তার উত্তরে সুকুমারের অভিমান ফুটে উঠেছে এইভাবে – "পেয়েছে কিনা তারই বা ঠিক কী ? অফিসে সবাই তো নতুন মুখ। আর সবগুলিই যে তোমার ছেলের মুখের তুলনায় কুচ্ছিৎ তাও নয়।"[৬৪] অর্থাৎ শীলাদের অফিসে সুকুমারের যাতায়াত আছে, সেখানকার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে সে ওয়াকিবহাল। একথা জেনে বিমলপ্রভা দেবীও স্বস্তি বোধ করেছেন। এরকম একটা অবস্থায় শীলার প্রতি সুকুমারের মনের অবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে একজন অতিমাত্রায় প্রগলভ ও লাস্যময়ী নারীচরিত্র আরতিকে উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে একটি কথা বলতে হয়, শীলা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছিল অনেক বেশি মার্জিত ও সংযত। সুকুমারও তা-ই। তবে মনে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা সে শীলার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে আশা ভেঙে গেলে স্বভাবিকভাবেই সুকুমার আহত হয়। শীলার প্রতি একপ্রকার ক্ষোভ তার মনের কোণে জমাট বাঁধে। এই প্রেক্ষাপটে সেই চাওয়া-পাওয়া যখন আরতি অযাচিত ভাবে দান করতে চায় তখন দ্বিধা থাকলেও শীলার প্রতি তীব্র অভিমান বশতই সুকুমার তা গ্রহণ করে। তবে আরতির এই অযাচিত দানের কারণ ছিল। জীবন অভিজ্ঞতা তাকে এমন একটি জায়গায় এনে দাঁড় করায় যেখানে নিজের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে সে বিভিন্ন পুরুষকে 'ব্যবহার' করে থাকে। তাই আরতি শুধুমাত্র সুকুমারকে তার প্রতি আকৃষ্ট-ই করেনি, অফিসের সুধাংশু রায়ের সঙ্গে শীলার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই যে আরতিকে চাকরি থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তা সে সুকুমারকে জানায়। ফলে একদিকে তীব্র অভিমান, অপরদিকে চাহিদা পূরণের টানে সুকুমার শেষ পর্যন্ত আরতির প্রতি মোহাবিষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে তার মানসিক অবস্থা এইভাবে ধরা পড়ে –"সুকুমারের মনে হল, আরতির কথাই ঠিক। কেবল হিসাব মেনে চললে, হিসাব করে চললে জীবনে বড় বঞ্চিত হতে হয়। হিসাব সবার জন্য নয়। মনকে আঁখি ঠেরে লাভ নেই, আরতিকে পাশে বসিয়ে চলার মধ্যে এই যে খুশিতে সুকুমারের মন ভরে

উঠেছে সে কথা স্বীকার করতে ভয় কী ?"[৬৫] তবে সুকুমার ও শীলার প্রেমের সম্পর্কটি-ই বোধহয় লেখকের মূল লক্ষ ছিল। এই কারণে সম্পর্কটির তথা শীলার মনের অনুভূতির বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যেই শীলার সঙ্গে তৃতীয় কোন পুরুষের সম্পর্ক রচনা করা হয়নি। সুকুমার ও শীলার সম্পর্ককে শুধুমাত্র প্রভাবিত করতেই আরতির মত একটি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

ঘটনাক্রমে দেখা যায় – দাদা অজিতের একটি চাকরির ব্যবস্থা হতেই শীলা সুকুমারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে সুকুমার তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং সুকুমার আরতিকেই বিয়ে করতে চায় তা শীলা জানতে পারে। এই ঘটনায় শীলা অত্যন্ত আহত হয়, অপমান বোধ করে। কেননা, সে সুকুমারকেই ভালোবাসে। তার মনেও তাকে ঘিরে নানাবিধ স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতির চাপে নিজের স্বপ্নগুলোকে সে পাশে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। শীলা আশা করেছিল সুকুমার হয়তো তাকে বুঝবে। কিন্তু এমন বিপরীত পরিস্থিতিতে তার মনেও প্রবল অভিমান এসে ভিড় করে। মনের সেই জায়গা থেকেই শীলা ভাবে –"সুকুমার একদিন তাকে ভালোবেসেছিল। আজ যদি সেই ভালোবাসা মরে গিয়ে থাকে হাজার কান্নাকাটি করেও সেই মৃত ভালোবাসা বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না শীলা। তাছাড়া কান্নাকাটি করতেই বা যাবে কেন ? পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া, একজনের স্ত্রী হওয়া ছাড়া আর কি কিছু করবার নেই।"[৬৬] এক্ষেত্রে বলা যায় – গভীর অভিমানগুলিই জমাট বেঁধে বোধহয় আত্মসম্মানবোধ তৈরী করে।

কাহিনীর ধারাবাহিকতায় উঠে আসে – অজিত তার বোনের জন্য এক পাত্র ঠিক করলে শীলা গোপনে সেই পাত্রের কাছে তার বিয়ে না করবার কারণ জানাতে গেলে সে জানতে পারে এই পাত্রের কাছ থেকে অজিত টাকা নিয়েছে। এই ঘটনা শীলার মনকে বিতৃষ্ণায় ভরে তোলে। তার জীবনের এমন পরিণতির জন্য এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শীলা পরিবারকেই দায়ী বলে মনে করে। তাই একরকম ক্ষোভে ও দুঃখে পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে কলকাতার বাইরে একটি স্কুলে চাকরি নিয়ে শীলা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। অপরদিকে আরতির চরিত্রের কথা জানতে পেরে সুকুমারের মোহ ভাঙে। কৃতকর্মের জন্য তথা শীলার প্রতি এমন প্রতারণা করবার জন্য সুকুমার আত্মগ্লানিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ পুনরায় শীলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বাধা দেয়। এমত অবস্থায় যে বিমলপ্রভাদেবীর মধ্যস্থতায় এই দু'জন নর-নারীর সম্পর্কের শুভ সূচনা হয়েছিল, তিনিই এসে শীলার বাইরে যাওয়া রোধ করেন। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ সেখানে একটা মধুর মিলনের ইঙ্গিত রয়ে যায়। এইভাবে

শুধুমাত্র কুটিল, জটিল, সর্পিলাকার অথবা গভীরভাবে সংক্রামিত সম্পর্কের রূপ-ই নয়, গভীর অভিমানে সিক্ত একটি মিষ্টি প্রেমের সম্পর্কের রূপ-বৈচিত্র্যকেও ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন।

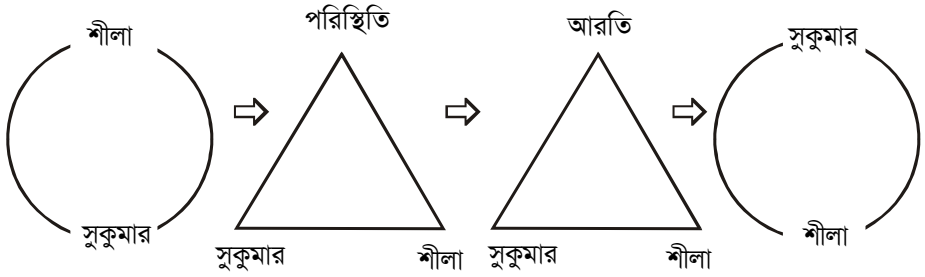


[ 'কন্যাকুমারী' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় মানব-মানবীর সম্পর্কের রেখাচিত্র ]

আলোচ্য উপন্যাসে আরতি চরিত্রটি সম্পর্কে যেমনই ভাবনা মনে আসুক না কেন, কাহিনীর শেষ পর্যায়ে তার প্রতি বোধহয় সকলেরই সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। আরতির মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নারীর পক্ষে নানা হাত বদল হয়ে এসে সুকুমারের মত সুদর্শন, চাকুরিরত, অর্থবান পুরুষকেই বিয়ে করাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায়, তার মানসিক উত্তরণ ঘটে। তার প্রাক্তন প্রেমিক বিজন আরতির জন্য জেল পর্যন্ত খাটে। সে ফিরে এসে আরতির কাছে আশ্রয় চাইলে আরতি তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। সে শেষপর্যন্ত হৃদয়রসকেই প্রাধান্য দিয়ে বিজনকে বিবাহ করতে উদ্যত হয়। আরতির উপর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা থাকলেও এই স্তরে এসে তার প্রতি সুকুমারের মনে এই প্রথম শ্রদ্ধা জাগে, একটি ভালোলাগা তৈরী হয়। মানব-মানবীর বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে এও একটি ধারা। যা আলোচ্য উপন্যাসে মূল সম্পর্ক ধারার (সুকুমার ও শীলা) পাশাপাশি এটিও একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

মনের উচ্চাশা একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে তিক্ততার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে এবং তার পরিণতিই বা কেমন হয়ে থাকে তারই যেন এক পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'জলপ্রপাত'** (১৯৫৯ সাল) নামক উপন্যাসটি। জীবন-সংসারে আমরা প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকের থেকে পৃথক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মিল থাকলেও এক এক জনের রুচি, মানসিকতা ও জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন। কখনো সম-রুচির পরিপ্রেক্ষিতে আবার কখনো যা নিজের মধ্যে নেই তা অন্যের কাছে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে দু'জন মানব-মানবী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পরকে ভালোবাসে। আর সেই সূত্র ধরেই সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তারা দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে কখনো কখনো একটি মানুষ তার বিপরীত

মানুষটির উপর নিজের মতবাদ তথা মানসিকতাকে চাপাতে চায়, তাকে সম্পূর্ণ নিজের মত করে গড়ে তুলতে চায়, তবে অন্য একটি সত্তাকে অবিকল নিজের প্রটোটাইপ করা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলস্বরূপ উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সংকটাপন্ন হয়। উভয়ের মধ্যেই মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে এবং ভুল বোঝাবুঝির পাহাড় জমতে জমতে এক সময় মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই ভুল বোঝাবুঝি যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকেই তাদের ভালোবাসার ধারাটিও আড়ালে চলে যায়, তা ম্লান হতে থাকে। তার গভীরতা তেমনভাবে আর তাদের চোখে পড়ে না, বা মনে সেইভাবে দাগ কাটে না। এক্ষেত্রে ঐ স্তরে তাদের মনের অভিমান ও বিতৃষ্ণা-ই বড় হয়ে ওঠে। এই বিষয়টিই আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রস্ফুটিত করেছেন। এই দিকটি বিস্তৃতভাবে অনুধাবন করেতেই আমরা এর কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করব। তার আগে উল্লেখ্য, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'ধরিত্রী' পত্রিকায় উপন্যাসটি 'শ্বেত পাথরের নুড়ি' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তা 'জলপ্রপাত' নামে বই আকারে বের হয়। লেখক রচনাটি 'সাইদা খানম'কে উৎসর্গ করেছিলেন।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী কথক চরিত্রের বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ এখানে পরোক্ষভাবে একজন চতুর্থ ব্যক্তির অর্থাৎ গল্প কাহিনীর কথক -এর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। সে যাই হোক না কেন, এই কাহিনীর প্রধান দুটি চরিত্র হিসাবে যে স্মরজিৎ ও শ্রীলেখাকে পাওয়া যায়, তারা কিন্তু পরস্পরকে ভালোবেসেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। জানা যায়, স্মরজিৎ পেশায় ডাক্তার হলেও আসলে তিনি ছিলেন একজন শিল্পী। তার নেশা ছিল ছবি আঁকায়। কিন্তু তার বিপরীতে স্ত্রী শ্রীলেখা ছিল প্রবলভাবে বিষয়ী ভাবনা দ্বারা পরিপুষ্ট একজন মানুষ। এই জায়গায় ক্রমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা জীবনবোধের পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা দেয়। যদিও স্মরজিৎ তার হৃদয়ানুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়ে একদিন নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে শ্রীলেখাকে বিবাহ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ বাবার সঙ্গে তার কম্পাউণ্ডার শ্বশুরের সম্পর্ক চিরতরে বিনষ্ট হয়। এবং ঘটনাক্রমে দেখা যায় শ্রীলেখা তার বাবার কাছে স্বামীকে বড় ডাক্তার হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কাজেই বলা যায়, যে ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে শ্রীলেখা একদিন একটি সম্পর্কের বলয়ে নিজেকে সংযুক্ত করেছিল, সময়ের প্রবাহমানতায় সেই আবেগকে ছাপিয়ে জীবনের এক বিশেষ লক্ষ্যকে শ্রীলেখা বৈবাহিক সূত্রে লাভ করে। আসলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে লালিত শ্রীলেখা বৈবাহিক সূত্রে অভিজাত পরিবেশ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। ডাক্তার শ্বশুর ও ডাক্তার স্বামীর সামাজিক যশ-প্রতিপত্তিতে তার মত

সাধারণ নারীর নামও জড়িয়ে যায়। শ্রেণীগত এই গোত্রান্তর তার মনে অহংবোধ জাগ্রত করে। সে স্বামীর খ্যাতি-প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে আপন অস্তিত্বকে ঐ সমাজে আরও সুদৃঢ় করতে চায়। আর এই চাওয়ার সঙ্গে তার বাবার প্রতিজ্ঞার বিষয়ও মিলে যায়। ফলে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাকে গভীরভাবে গ্রাস করে। এই নেশায় সে মত্ত হয়ে ওঠে। স্বামী স্মরজিৎ তার বাবার খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যাবেন – এই ছিল শ্রীলেখার পণ; এই স্তরে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই পেশার গুরুত্ব সম্পর্কে সে প্রতিনিয়ত স্বামীকে সচেতন করে। এবিষয়ে আপন মতাদর্শও স্মরজিতের উপর আরোপ করে। আরও বড় হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সফল ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা টেনে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সকলকেই আপন ইচ্ছামত চালনা করা যায় না, বা, সবাই সব বিষয়ে সফল হতেও পারে না। সমস্ত কিছুরই একটা সীমারেখা বর্তমান আছে। আর এখানেই প্রশ্নচিহ্ন যুক্ত হয়ে যায়। জটিলতার সূত্রপাত ঘটে। তবে স্বামীর জন্য এমন কল্যাণ কামনা করাকেই শ্রীলেখা তার ভালোবাসার নামান্তর বলে জেনেছে। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ভালোবাসা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়। তার অস্তিত্ব অনুভবে বিরাজমান। যার ধারা শ্রীলেখার ক্ষেত্রে অন্তরের অন্তরালে বিষয়ী ভাবনার দ্বারা চাপা পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, একটি সম্পর্ক কখনোই এক লয়ে চলতে পারে না। সময় ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে তা বিভিন্ন রূপ বদল করতে করতে এগিয়ে চলে। ফলে একই ধারায় আসে নানা বৈচিত্র্য।

অপরদিকে, স্মরজিৎ একজন শিল্পী। তিনি ভালোবাসার পূজারী। অন্তরের এই সৌন্দর্যের দিকটিই তিনি তার শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে বিকশিত করেন। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি তার অন্তরের ভালোবাসাকে নব রূপে খুঁজে পান। সুতরাং বৈষয়িক বিষয়ে উদাসীন এই মানুষটি হৃদয়ের অনুভূতিকেই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান। জীবনের অন্যান্য বিষয় এই মর্মে তার কাছে মূল্যহীন। কাজেই স্ত্রীর উচ্চাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে তিনি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাই তাদের দাম্পত্য জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেউ কারও সত্তাকে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন মনে করে না।

শ্রীলেখা যতই স্বামীকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে চায়, স্মরজিৎ ততই নিজেকে স্ত্রীর মানসিকতা থেকে লক্ষ যোজন দূরে সরিয়ে রাখেন। ফলস্বরূপ বৈষয়িক চিন্তাভাবনার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হোঁচট খায়। এইভাবেই সময়ের আবর্তে ভালোবাসার রং ফিকে হতে থাকে। কাজেই তাদের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। আর এই তিক্ততা আরও বেশি

গাঢ় হয় তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কমলাক্ষবাবুর পরোক্ষ প্রভাবে।

তাদের সম্পর্ক যখন সংকটের চরম শিখরে তখন শ্রীলেখাও অনুধাবন করে – সে তার লক্ষে পৌঁছোতে ব্যর্থ, উদ্দেশ্য সফলের দৌড়ে কখন যেন সে তার স্বামীর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এমনকি, সূচনা পর্বে তাদের সম্পর্কের সেই প্রাণসত্তাকেও চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। নিজের এমন চরম পরাজয় এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের যন্ত্রণায় শ্রীলেখা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। এসমস্ত কিছুকে স্বীকার করবার শক্তিও আজ তার বিলুপ্ত। উচ্চাশার মত্ততার নেশা কেটে যাওয়ার পর শ্রীলেখা তাদের সম্পর্কের বর্তমান স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। অথচ সম্পর্কের সেই স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনবার আত্মবিশ্বাসও তার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তীব্র অভিমান ও আত্মগ্লানিতে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় – "…. না শিল্প নয়, সাহিত্য নয়, ও ধরণের পরোক্ষ প্রাপ্তি ঢের হয়েছে। আমি রক্তমাংসের জীবন। আমি চাই সাংঘাতিক কিছু করতে। খুব সাংঘাতিক।"[৬৭] সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই শ্রীলেখা নর্মদা 'জলপ্রপাত'-এ নিজের প্রাণ বিসর্জন করে। জলপ্রপাত -এ যেমন অবিরল জলধারা ফুলে ফেঁপে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তাকে নিম্নেই পতিত হতে হয়, সমতলে নদী ধারা হিসাবে বাহিত হতে হয়। ঠিক তেমনিই যেন মানুষের মনের ইচ্ছা, চাহিদাগুলি পরিপূর্ণ হওয়ার তাগিদে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা পূর্ণ হওয়ার একটা সীমারেখা থাকে। ফলে একটা পর্যায়ে এসে সেই উত্তাল অদম্য ইচ্ছাগুলির ব্যর্থতা উপলব্ধি করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়। তবে এই পরাজয়কে মেনে নিয়ে অনেকে সংসারে থেকে যায় আবার কারও পক্ষে তা স্বীকার করবার শক্তি থাকে না। আলোচ্য উপন্যাসে হয়তো শ্রীলেখার পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের এমন চরম অবনতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সে অপারগ। তাই সেই জায়গা থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে লেখক এখানে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাদের সম্পর্কের নানা সূক্ষ্ম স্তরকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। আলোচ্য কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সম্পর্কে একদিকে উচ্চাশা অপরদিকে বস্তু জগতের প্রতি উদাসীনতা এই দুইয়ের সৃষ্টি করেছেন এবং তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি টেনেছেন।

মানব-জীবন বিচিত্র সম্পর্কে জড়ানো। নর-নারীর মূলত প্রেমের সম্পর্কেও আছে নানা স্তর। এই প্রেম মানুষের মন ও বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনের এক এক পর্বে এক এক

ভাবে ধরা দেয়। এর পূর্বে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' কিংবা 'জলপ্রপাত' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার জীবনের যেমন নানা ওঠা-পড়া, ছন্দপতন, চাওয়া-পাওয়ার তরঙ্গ ধারা লক্ষ করেছি ঠিক তেমনি বিবাহ-পূর্ববর্তী পর্বের নর-নারীর সম্পর্কেও আছে ভিন্ন ভিন্ন সুর-তাল-লয়। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতেও তা ভিন্ন মাত্রায় ধরা পড়েছে, যা তিনি তাঁর এক একটি সৃষ্টিতে এক এক ভাবে পরিবেশিত করেছেন। যেগুলির স্বাদ বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। সেরকম একটি জটিল সম্পর্কের আবর্ত উন্মোচিত হয়েছে তাঁর **'তিন দিন তিন রাত্রি'** (১৯৬০) উপন্যাসে।

'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিক ভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্সের সহযোগিতায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে এটি বই আকারে আত্মপ্রকাশ করে। লেখক তাঁর প্রিয় বন্ধু সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয়কে রচনাটি উৎসর্গ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী বয়ন করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনটি চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কের যে সমীকরণ দাঁড়ায় তা হল –

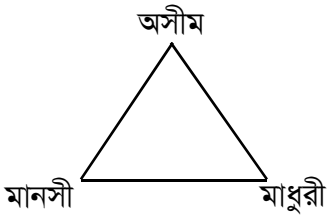


১) অসীম ও মানসীর সম্পর্ক
২) অসীম ও মাধুরীর সম্পর্ক
৩) মানসী ও মাধুরীর সম্পর্ক

অর্থাৎ এখানে ত্রিকোণ ফ্রেমের কেন্দ্রীয় কোণে অবস্থান করছে কাহিনীর নায়ক অসীম। অপর দুটিতে আছে মানসী ও তার দিদি মাধুরী। উপন্যাসের নামানুসারে কাহিনীর সময়-কালও তিনটি দিন ও তিনটি রাত। এই সময়পর্বে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা কত বিচিত্র রূপ ধারণ করতে পারে তারই এক পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। সেই সম্পর্কগুলির প্রকৃতি চিনতে এবং চরিত্রগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি কেন, কোন পরিস্থিতির সাপেক্ষে কীভাবে রূপ পরিবর্তন করছে তা জানতে হলে আমাদের তিনটি চরিত্রের জীবনবোধকে উপলব্ধি করতে হবে।

উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র অসীম। সে মানসীর দাদা শঙ্করের বন্ধু। তবে বর্তমানে মানসী তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। পুলিশে কর্মরত অসীম ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা শহরে এসে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে মানসীদের বাসায় ওঠে। এখানেই কাহিনীর সূত্রপাত। অর্থাৎ অসীম ও মানসীর মধ্যে একটি সম্পর্ক পূর্বেই রচিত হয়েছিল। তারই একটি পর্যায় দিয়ে কাহিনী সূচিত

হয়েছিল এবং তিন দিন তিন রাত – এই সময় প্রেক্ষাপটে সেই সম্পর্ক ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে।

লেখকের কলমে অসীম চরিত্রটি যেভাবে উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় – তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বড় অভাব। আর এই বিষয়টি ছিল তার জীবনের সমস্ত জটিলতার মূল কারণ। এই দুর্বলতা শুধুমাত্র তাকেই প্রভাবিত করেনি, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পর্কেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই চরিত্রটির সঙ্গে 'চেনামহল' উপন্যাসের অরুণের খানিকটা মিল পাওয়া যায়। লক্ষ করা যায় – মফঃস্বল শহরে কর্মরত অসীম নিজেই তার কর্মজীবনকে অপছন্দ করে। তার সামাজিক অবস্থান তাকে কোন তৃপ্তি দেয়নি। অসহায় ও নিঃসঙ্গবোধ সর্বদা তাকে তাড়িত করেছে। সে অবিরত আত্মচিন্তায় মগ্ন। ভিড়ে ভর্তি বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অসীমের মনোভাব কীরকম হয়েছিল তা উঠে এসেছে এইভাবে – "অসীমের মনে হল এরই নাম জনতা, জনগণের তাল। এই ভিড়ের মধ্যে থেকেও এদের প্রত্যেকেই অসীমের মতই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং আত্মচিন্তায়মগ্ন। এছাড়া উপায় নেই। মানুষ একই সঙ্গে একক এবং দশজনের সঙ্গে দশজনের মধ্যে একজন। বাকি ন'জনের সঙ্গে তার সম্বন্ধে কখনো প্রতিযোগিতার, কখনো ঔদাসিন্যের কখনো সহযোগিতার। এই ন'জনের মধ্যেও কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ একেবারে কেউ না।"[৬৮] অর্থাৎ একটা একাকীত্ববোধ সবসময় তার মধ্যে কাজ করত। সে জানে অহংকার করবার মত কোন পৌরুষত্ব তার নেই। একথা অসীম শুধুমাত্র নিজে স্বীকার করে তা নয় প্রেমিকা মানসীর কাছেও তার আত্মগ্লানি তুলে ধরে। আসলে নিজেকে নিয়েই অসীমের মনে অসন্তোষ রয়ে গিয়েছে। আত্মপ্রত্যয় হীনতা তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেছে। অসীমের হীনমন্যতা বোধ থেকেই জাগ্রত বিশেষ সংশয় প্রতিনিয়ত মনের কোণে ক্রিয়া করেছে। তাই দেখা যায় – কলকাতা শহরে বাস করে অভ্যস্ত মানসী, কখনো অসীমের সঙ্গে মফঃস্বলে গিয়ে জীবন কাটাবে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে, এই চরিত্রটির নিজের উপর যেহেতু কোন আস্থা নেই সেহেতু সেই নিরিখেই সকলকে সে বিচার করেছে। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অসীম তার ত্রুটি অকপটে স্বীকার করেছে, অপরের কাছে প্রকাশও করেছে। কিন্তু সেই দুর্বলতার কথা যখন সে মানসীর কাছ থেকে শুনেছে তখন আহত হয়েছে। বিষয়টি একদিকে স্বাভাবিক। কারণ সকলেই তার কাছের মানুষের কাছ থেকেই সহমর্মিতা আশা করে। তবে একথাও ঠিক অসীম একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। নিজের সীমানার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই তার নেই। কেননা, আত্মবিশ্বাসের অভাব কিংবা নিজেকে নিয়ে অতৃপ্তির

প্রসঙ্গে অসীম নানাভাবে আক্ষেপ করেছে ঠিকই কিন্তু তাকে উত্তীর্ণ করবার কোনও রকম প্রয়াস বা সদিচ্ছা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। এদিক থেকে বলা যায় – সে সত্যি সত্যি তার আত্মবিশ্বাসহীনতা নিয়ে চিন্তিত নয়। সে আসলে নিজেকে নিয়ে পুরোপুরি না হোক খানিকটা তৃপ্তিই বোধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে অসীম একজন কর্মভীরু, অলস মানুষ। ভাবনা চিন্তা আছে কিন্তু তা বাস্তবায়িত করবার কোন প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। তাই বলা যায় – নিজের সম্পর্কে আক্ষেপ, অনুশোচনা আসলে তা অসীমের একপ্রকার বিলাসিতারই নামান্তর ছিল। এ প্রসঙ্গে মানসীর অভিব্যক্তি – "সে তো অক্ষম নয়, অশিক্ষিত নয়, শুধু অসন্তুষ্ট। এক ধরণের অসন্তুষ্টি আছে যা মানুষকে উন্নত করে; শক্তিতে, সামর্থে, কৃতিত্বে, সম্পদে ধাপে ধাপে তাকে উঁচু থেকে আরও উঁচু সিঁড়িতে তুলে দেয়। সেই অসন্তোষ শিল্পীর, গুণীর, বিদ্বানের, বিত্তবানের; যে-কোনও উচ্চাভিলাষী, জীবনাভিলাষী মানুষের। কিন্তু অসীমের অসন্তুষ্টির জাত আলাদা। সেই অসন্তোষ কখনও তার রোগ, বাতিক কখনও বা বিলাস। তা অসীমকে কোনও কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নৈরাশ্যে নৈষ্কর্মে নিমজ্জিত করে রাখে।"[৬৯] অর্থাৎ বলা যায় – অসীমের আত্মবিলাপ তাকে একপ্রকার আত্মতৃপ্তিই দান করেছে।

সুতরাং তার জীবনও গতানুগতিক ধারায় বাহিত হয়েছে এবং মানসীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা-ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে। কাহিনী সূত্রে উঠে আসে – এক বোন ছিল, তাকে বিয়ে দেওয়ার পর সংসারের প্রতি আর কোন দায়-দায়িত্ব অসীমের নেই। কাজেই, সে ইচ্ছে করলেই নিজেকে সেভাবে তৈরী করতে পারত, যাতে সে পরিতৃপ্তি পায়। এপ্রসঙ্গে অসীমের-ই আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে লেখক এই চরিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন – "অসীম নিজেকে উৎসাহ দেয়, উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করে। .....তার মতো মুক্ত পুরুষ আর কে আছে ? সে ইচ্ছা করলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারে। আর কোনও কাজ যদি খুঁজে না-ও পায় দু'একটা টুইশান সম্বল করে স্বাধীনভাবে দিন কাটাতে পারে অসীম। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সাহসটুকু অসীমের নেই। .....কিন্তু আসলে সে আর পাঁচজনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাঁচজন মানে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক। সে তার হাতে কাদার পুতুল। অমনিতে সে নিয়তি মানে না, অদৃষ্ট মানে না, শুধু স্বয়ং কর্তৃত্বে, শুধু পুরুষকারে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস শুধু একটা ফ্যাশন, শুধু আধুনিক বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবার আত্মপ্রসাদ। চলবার সময় পুরুষকারকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে চলে। সবদিক থেকে অন্যনির্ভর পুরুষের কোথায় পুরুষকার, কোথায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ? পুরুষ শুধু আকারে, পৌরুষ শুধু বাক্যে

আর বিতর্কে। আর কোথাও তার পুরুষকারবাদের অস্তিত্ব নেই। তাই সে যা হতে চায়নি তাই হয়েছে এবং হওয়ার পরেও বলছে, চাইনে চাইনে"[৭০] স্বাধীন হওয়ার সাহস না থাকলেও অসীম যেহেতু বিলাসিতাকে প্রাধান্য দেয় সেহেতু ঐ বিলাসিত মন থেকেই তার অন্তরে বাসনা জেগে উঠেছে। তবে সেই বাসনার দীপ্তি মানসীর মনে সঞ্চারিত করতেও সে ব্যর্থ। তা সে নীরবে মনের কোণে লালিত করেছে। লক্ষ করা যায় – আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মত রূপ-সৌন্দর্যও তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বন্ধু শঙ্করের স্ত্রীর দেহ-সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে এবং সে নিজেই স্বীকার করে সেই সুন্দর প্রতিমূর্তি দর্শনের সময় কারও কথা, এমনকি, মানসীকেও তার মনে পড়েনি। অপরদিকে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধু শঙ্করের সঙ্গে তার নিজের তুলনা এসেছে। অসীম আক্ষেপ করেছে কারণ সে শঙ্করের মত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়, যে তার ভালোলাগার পাত্রীকে পরিবার থেকে একরকম ছিনিয়ে এনে সুখে সংসার করছে, জীবনের দাবীকে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অসীমের পক্ষে মানসীকে সেভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য সে নিজের সঙ্গে সঙ্গে মানসীকেও দায়ী করেছে। আসলে, অসীম নিজেকে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে সে যে কি চায় সে বিষয়ে তার মনে দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। তাই বলা যায়, মানসীকে সে যে ভালোবাসত, তাতে আবেগ কতখানি গভীর ছিল তা প্রশ্নাতীত বিষয়। কাজেই, এমন একজন জীবনবোধের অধিকারী মানুষ যে আত্মসমালোচনা করবে কিংবা সংশয়গ্রস্ত থাকবে; শুধু তাই নয়, অন্যান্য মানুষকে বিশেষত মানসীকেও যে নিজের মত করে বিচার করবে তা খুব স্বাভাবিক।

অপরদিকে মানসী চরিত্রটিকে লেখক ভিন্ন এক জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। নাগরিক সভ্যতার বুকে বসবাসকারী অর্থকষ্টে জর্জরিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ে হিসাবে মানসী চরিত্রটিকে চিত্রিত করা হয়েছে। দেখা যায় – তার একমাত্র দাদা বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে, বৃদ্ধ বাবার আয় বলতে তিনি টুইশন পড়ান, মেজদিদি মাধুরী একটি স্কুলে চাকরি করে এবং মানসী নিজে একটি গ্রন্থাগারে কর্মরত। এছাড়া আরও চারজন ছোট ছোট ভাই-বোন পরিবারে আছে। বাড়ির সেজো মেয়ে হয়েও সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মানসীর উপরেই ন্যস্ত। কাজেই, এই দায়িত্ব-কর্তব্য -এর ভারে নিজের মনের চাওয়া-পাওয়াকে সর্বদা বড় করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আসলে এই মানসীকে ঔপন্যাসিক কঠোর বাস্তববাদী চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন। যুগের সঙ্গে তথা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে কীভাবে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং পরিবারকে চালিত করতে হয় তা তার নখদর্পণে ছিল।

দেখা যায় – তাদের রক্ষণশীল পরিবারকে ঘষে-মেজে খানিকটা সচল করতে পেরেছিল। পরিবারের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিংবা আর্থিক বিষয়ে মানসীর উপরেই সকলে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ব্যক্তিত্বশালিনী মানসীর ব্যক্তিত্বকে আরও দীপ্তিময় করে তুলেছিলেন কর্মক্ষেত্রে পরিচিত প্রৌঢ় বন্ধু – ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপক প্রিয়গোপাল বাবুর সাহচর্য। বয়সে, বিদ্যাতে কিংবা প্রতিষ্ঠায়-মর্যাদায় মিল না থাকলেও তাঁর মননের সঙ্গে মানসী নিজের মনের মিল খুঁজে পেয়েছিল। তাই সে এই বন্ধুত্বকে স্নেহ-প্রীতির ও প্রগাঢ় সম্পর্ক বলে আখ্যা দিয়েছে। তবে প্রেমের সঙ্গে এই সম্পর্কের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কিন্তু অসীমের মন একে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানসীর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রসঙ্গে অসীমও ওয়াকিবহাল ছিল। দেখা যায়, অসীম মানসীকে পরিহাস ছলে যখন জানায় – "আমি যদি সে যুগে জন্মাতাম, তোমাকে অসূর্যস্পশ্যা করে রেখে দিতাম।"[৭১] তখন মানসী উত্তরে হেসে জানায় –"আমার বহু ভাগ্য যে, সে যুগে জন্মাইনি। জন্মালেও আমি সেই যুগের বাঁধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতাম। কোনও পুরুষই আমাকে আটকে রাখতে পারত না। তা সে যত বড় জাঁদরেল পুরুষই হোক, আর সমাজ-শাসনের যত কড়া নিয়মকানুনই তার হাতে থাকুক।"[৭২] অতএব, আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে – অসীম ও মানসী এই দুজন মানুষের মতাদর্শ, মানসিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বোপরি জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই, তারা তাদের মত করে জীবনকে দেখেছে এবং একে অপরকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। ফলে তারা পরস্পরকেই ভুল ব্যখ্যা করেছে। আর তারই প্রভাব তাদের সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা যত নিজেদেরকে জেনেছে, বুঝেছে তত তাদের সংকটাপন্ন সম্পর্ক আরও জটিল হয়েছে। সুতরাং প্রেমানুভূতির তুলনায় বাহ্যিক বিষয়গুলি ও উভয়ে ত্রুটিগুলিই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ যেমন অভ্যাসের দাস তেমন এদের সম্পর্কটিও যেন একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

তাই লক্ষ করা যায় – মানসীর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে অসীম নমনীয় হীনতা বলে মনে করেছে। মানসী তথাকথিত সুন্দরী নয়, তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা নিয়ে সে কোন আক্ষেপ করেনি। বরং বিষয়টি নিয়ে উদাসীন থেকেছে। কাজেই, অসীমের চোখে মানসী বাসনাহীন ম্লান একটি চরিত্র হিসাবে ধরা দিয়েছে। অসীমের মনে হয়েছে যেহেতু মানসী তার এই দুর্বলতার কথা জানে তাই অসীমের কাছে সে ধরা দিতে চায়নি পাছে সহজে ছাড়া পেতে হয়। এ প্রসঙ্গে অসীমের মনোভাব ফুটে উঠেছে এইভাবে – "আসলে মানসী জানে সে অত বড় নয়। তার গর্ব করবার মতো বিশেষ কিছু নেই। অসীম যদি তাকে ভালোবেসে থাকে দয়া করেই

ভালোবেসেছে। কিন্তু পাছে তার দয়াটা ধরা পড়ে তাই মানসী সবসময় এমন একটা ভাব নিয়ে চলে যেন সে-ই অসীমকে দয়া করেছে। বারবার মনে করিয়ে দেয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সামর্থ্যে অসীম পৌরুষের পরিচয় দিতে পারেনি।"[৭৩] লক্ষণীয়, অসীমের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার অহংবোধ ও হীনমন্যতা দুই-ই একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। চারিত্রিক স্বভাবগুণের জন্যই মানসী নিজেকে সেভাবে সকলের কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে পারেনি। এমনকি বাড়িতে এসে অসীম যেভাবে মানসীকে পেতে চেয়েছিল সেক্ষেত্রেও পরিবারের সকলের সামনে মানসীকে সংযত থাকতে হয়েছে। আর তাই অসীমের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অসীমের মনে হয়েছে – তার মানসিক দুর্বলতার কথা জানে বলেই মানসীর আকর্ষণ অসীমের প্রতি দুর্বার নয়। তাই সে পরিবারের প্রতি দায়-দায়িত্বের দোহাই দেয়। কিন্তু আমরা পাঠককুল অনুমান করতে পারি – মানসীর মত সাহসী ও কর্মোদ্যোগী একজন নারী; যে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য নিজের কাঁধে নিয়ে চলবার মত প্রবণতা রাখে, তার মত বাস্তববাদী, কর্তব্যপরায়ণা নারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন একজন জীবন সঙ্গীকেই সে যে কামনা করবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে অসীম বিপরীত আদলে গড়া। মানসী পুরুষের পৌরুষত্ব বলতে অর্থ-যশ-খ্যাতিকে বোঝায়নি, তার মতে পৌরুষত্বের মূলে থাকে ব্যক্তির আত্মগৌরব, আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মবিশ্বাস ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই জীবনে সাফল্য এনে দেয়।

অপরদিকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষের প্রতি ভালোবাসার তুলনায় অনুকম্পা থাকে বেশি। আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মত মানসীও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তার মনেও আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ভিড় করে। প্রকাশ না করলেও অসীমকে ঘিরে সেও স্বপ্ন দেখে। মানসী অসীমকেই ভালোবাসে। প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে – মানসী ভালোবাসে বলেই নিজের জীবনের কথা ভেবে দিদির বিয়ের উদ্যোগ নেয়, প্রিয়গোপালবাবুর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সে অসীমের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সুপারিশ চিঠি এনে দেয়। লক্ষ করা যায়, বাড়িতে এসে থাকাকালীন মানসী যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই অসীমের কাছে এসে নানা কথার মধ্য দিয়ে নিজের মনের গোপন কথাকে আভাসে ইঙ্গিতে তুলে ধরেছে। যদিও তা অসীমের কাছে মনভোলানো কথা বলে মনে হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ভালোবাসা পরস্পরের প্রতি তীব্র অধিকারবোধের জন্ম দেয়। তাই লক্ষ করা যায়, অসীমকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই দিদি মাধুরী ও অন্যান্য বোনদের প্রতি মানসীর মনে ঈর্ষা জন্মে। যা ধীরে ধীরে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে এবং মনের তীব্র যন্ত্রণা থেকেই সে দিদির প্রতি অবচেতন অবস্থাতেও আর্তনাদ করে ওঠে –

"দিদি, তুই এই করলি?"[৭৪] তাই বলা যায়, মানসী প্রকৃতপক্ষে অসীমকেই ভালোবেসেছিল ঠিকই তবে তাকে শ্রদ্ধা করতে পারেনি। ফলে মানসীর মনে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েন কাজ করত।

অপরদিকে অসীম তাদের এই দীর্ঘকালীন বৈচিত্র্যহীন সম্পর্কের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যেই কলকাতা শহরে আসে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে মানসীর কোন ইতিবাচক সাড়া পায়না এবং মানসীকে অসীম যেভাবে পেতে চেয়েছিল অর্থাৎ নারীর যে সেবা-পরায়ণ কোমল রূপ যা দেখে মুগ্ধ হতে চেয়েছিল কিন্তু অসীমের সে আশাও পূর্ণ হয়নি। যা খানিকটা মানসীর দিদি মাধুরীর কাছ থেকে সে লাভ করেছিল। কাজেই, মানসীর উপর প্রবল অভিমানের বশবর্তী হয়েই অসীম মাধুরীর প্রতি দুর্বলতা দেখায়। এখান থেকেই অসীম ও মাধুরীর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে অসীম ও মানসীর সম্পর্ক ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। পরিবর্তনশীল সময়কাল ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মানব-সম্পর্কের এই বহুরূপতা সত্যিই বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে লেখকের দার্শনিক মতাদর্শ উপন্যাসের নায়ক চরিত্র অসীমের আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে – "নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মতো ব্যষ্টি আর সমষ্টির সম্পর্কও বিচিত্র আর জটিল। সে সম্পর্ক পরিবারের মধ্যেই হোক, সমাজের হোক আর রাষ্ট্রেরই হোক তার জটিলতা কোনওদিনই উন্মোচিত হবে না। এক গিঁট খুলবে, আর একটি গিঁট পড়বে। যতদিন সমাজ আছে, সংসার আছে এই গিঁট খোলা, গিঁট বাঁধার পালা চলতেই থাকবে। কারণ এই গ্রন্থির মধ্যেই যত রস যত রহস্য।"[৭৫] চেনা মানুষগুলি এই রস ও রহস্যে কত গভীরভাবে নিমজ্জিত তারই সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। চেনা চরিত্রগুলি কীভাবে সেই রস রহস্যের দ্বারা ক্রমশ অচেনা হয়ে ওঠে, কেমন সেই চেনা বনাম অচেনা সত্তার স্বরূপ তা লেখক বার বার তাঁর গল্প-উপন্যাসে উন্মোচন করেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক নতুন পালক যুক্ত করেছে।

আলোচ্য এই 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসে সবচেয়ে সহানুভূতির পাত্রী বোধ হয় মাধুরী চরিত্রটি। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের একেবারেই চেনা চরিত্র। আবেগপ্রবণ একটি ঘরোয়া মেয়ে। সে আর কয়েকজন সাধারণ নারীর মত গতানুগতিক ধারায় ছোট ছোট স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। বাস্তবের কষাঘাত তার জীবনে নেমে এলেও মাধুরী ততখানি বাস্তববাদী চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। মনের ভাবাবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। তাই দেখা যায় – বাড়ির মেজো মেয়ে মাধুরী অর্থ-উপার্জন করলেও ততখানি দায়িত্বশীল তথা কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারেনি। এখানেই বোন মানসীর সঙ্গে তার পার্থক্য। আর সকল যুবতীর মতোই সে তার ভাবী জীবন সম্বন্ধে অর্থাৎ বৈবাহিক জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তবে

বিয়ের বাজারে পাত্র-পক্ষের দর কষাকষিতে তার সে স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। মনের বিষন্নতা তার মুখেও প্রতিফলিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে মাধুরীকে নিয়ে অসীমের মনের ভাব তুলে ধরা যেতে পারে – "যেমন মানসী সব বন্ধ করে রেখেছে। সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বিয়ে করবে না। এই নিয়ে তাকে যেন কেউ বিরক্ত করতে না আসে। তার সেই একটি 'না'তেই কাজ হয়েছে। কিন্তু মাধুরীর বোধহয় তত মনের জোর নেই। তার মন এখনও দ্বিধা-দুর্বল। যে এই দৌর্বল্য দূর করতে পারে, সব সংশয় ঘোচাতে পারে, তেমন কারও দেখা কি মাধুরী জীবনে পায়নি ? তেমন কারও কণ্ঠ শোনেনি, যার কথার ওপর সে নির্ভর করতে পারে ? নাকি পেয়েও হারিয়েছে ? যদি হারিয়ে থাকে, কার দোষে ? তার না মাধুরীর নিজের ?"[৭৬] অসীমের এই অনুসন্ধানী মন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছিল মাধুরী ও সে একই গোত্রের। তাদের মধ্যে মিল আছে অনেকখানি। তাই মাধুরীর প্রতি দুর্বলতা তথা একপ্রকার সহানুভূতি তার মনে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। অসীমের প্রতি মানসীর ক্রমাগত উদাসীনতা (অসীমের দৃষ্টিতে) তার সেই বোধকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করে।

অপরদিকে, মাধুরী তার মনের শূন্যতার জায়গাটি মানসীও অসীমের সম্পর্কের ধারাটিকে উপভোগ করে পূরণ করত। বোন মানসীর মধ্য দিয়েই সে যেন ঐ সম্পর্কের রহস্য অনুধাবন করত। বিষয়টি তার মনে বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছিল। তাই হয়তো মানসী বা পরিবারের কেউ অসীমের সঙ্গে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রবিাদদ করে উঠেছে। এই প্রতিবাদের মূলে ছিল মনের সুপ্তবাসনা বনাম বিবেকবোধের তাড়ণা। এই কারণেই হয়তো মা যখন মাধুরী ও অসীম এই দু'জনকে একসঙ্গে খেতে দেওয়ার কথা বলেছে তখন 'দু'জন'কে কথার মধ্য দিয়ে মাধুরী যেন নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিল। লক্ষ করা যায় – মাধুরী প্রাথমিক পর্যায়ে তার বিবেক-বোধকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। কিন্তু অসীমের আন্তরিকতা, তার মনের মধ্যেকার হাহাকার ও ক্রমাগত কথার মায়াজাল মাধুরীর মনকে টলিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ সে তার তৃষিত হৃদয়সহ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অসীমের কাছে সমর্পণ করে। যার মধ্য দিয়ে সে নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান পায়। এক লহমায় তার বৈচিত্র্যহীন অন্ধকার জীবন রঙিন হয়ে ওঠে। জীবনের এক অভিনব স্বাদ সে অনুভব করে। সেই প্রথম প্রেমানুভূতিকে মাধুরী চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মানসীর করা সমস্ত অভিযোগ মাধুরীর কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে। মাধুরী মনে করে – ভালোবাসা চিরনতুন, এর কোন শেষ নেই, তা বৈচিত্র্যের নানা রঙে রঙিন। এই প্রেমানুভূতির ঐশ্বর্য দিয়েই সমস্ত হীনতা-দীনতাকে জয় করা সম্ভব, যশ-খ্যাতি-ব্যক্তিত্ব সেখানে তুচ্ছ। লক্ষণীয়, এই আবেগানুভূতির বশবর্তী হয়েই মাধুরী তার প্রথম প্রেমের অনুভূতিকে সকলের সামনে স্বীকার

করতে চেয়েছিল।

যদিও সে যখন অনুধাবন করেছে অসীম কোন অনুভূতির বশে নয়, মানসীর প্রতি তীব্র অভিমানে, ঈর্ষায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাধুরীকে গ্রহণ করেছে তখন মাধুরী ভীষণভাবে আহত হয়। লজ্জা-অপমান ও ঘৃণায় তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। অপরদিকে বোন মানসী যখন আর্তনাদ করেছে – 'দিদি, তুই এই করলি?' – তখন মাধুরী বিবেকের তাড়নায় তাড়িত হয়েছে। তাই বোনের কাছে মর্যাদা ফিরে পেতে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে সে বাবাকে মিথ্যে করেই জানায় যে মানসী ও অসীম বহুদিন আগেই 'রেজিষ্ট্রি বিয়ে' করেছে। তবে মাধুরী তার সেই হৃদয়ানুভূতিকেই সঙ্গী করে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কেননা, তা একান্ত তারই হৃদয়রসে সিক্ত, সেখানে কোন মিথ্যার ছাপ নেই। তাই তা স্বীকার করবার মধ্য দিয়ে সেই প্রেমানুভূতিরই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। মানব-সম্পর্কের বিচিত্ররূপের আরও একটি দিক এখানে ধরা পড়েছে। অপরদিকে মানসী যে তার দিদিকে প্রাণের দোসর রূপে ভালোবেসেছে সেই দিদি মাধুরী যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, স্বাভাবিকভাবেই তাতে মানসীর অন্তরাত্মা আহত হয়। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে দিদির করা সমস্ত ঠাট্টা পরিহাসকে মানসীর সত্যি বলে মনে হয়েছিল। কাজেই, দিদির প্রতি একরকম ক্ষোভ, ঘৃণায় তার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে সেই দিদির কাছ থেকে নিজের প্রাপ্যকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মানসী তীব্র অপমান বোধ করেছে। তার মত ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর পক্ষে এ ছিল সবচেয়ে বড় পরাজয় ও লজ্জাকর বিষয়, যা গ্রহণ করতেও দ্বিধা ও তা ত্যাগ করাও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ সে অসীমকেই ভালোবাসে। তাই তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানসীর দু 'চোখ বেয়ে জল আসে – "হারিয়েও কান্না, পেয়েও কান্না। দিয়েও কান্না, নিয়েও কান্না।"[৭৭] এই কান্না, এই লজ্জা, এই গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচনের দক্ষ কারিগর শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

এভাবেই আলোচ্য উপন্যাসে তিন দিন তিন রাতের সময় প্রেক্ষাপটে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ মানসীর সঙ্গে অসীমের, অসীমের সঙ্গে মাধুরীর এবং মানসীর সঙ্গে মাধুরীর সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও মানবিক অনুভূতির সাপেক্ষে নানা রূপ ধারণ করেছে এবং অসীমকে লাভ করবার মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক যে নতুন রূপ ধারণ করে, তা কতখানি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

মন ও শরীর এই দুইয়ের মিলনেই একটি মানুষের সামগ্রিক সত্তা গঠিত হয়। আর এই দুইয়ের চাহিদা পূরণের তাগিদে মানব-মানবীর মধ্যে একটি সম্পর্ক আপন খেয়ালেই গড়ে

ওঠে। এটিই জীবনের পরম্পরা। এক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক নানা বিষয় তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সর্বোপরি মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের নিয়মাবলী-সংস্কার মানুষের মনে 'বিবেক' নামক এক বিশেষ অস্তিত্বকে জাগরিত করে। সেখানে এসেই নানা সম্পর্ক হোঁচট খায়। ফলে জীবনের দাবী ও বিবেকের দাবীর টানাপোড়েনে মানব-চরিত্রগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়। তার প্রভাব সম্পর্কেও প্রতিফলিত হয়। আর এই প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্কগুলো ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন আঙ্গিক খুঁজে পেতে চায়। এটিই হল সম্পর্কের তথা জীবনের স্বাভাবিক পরম্পরা – যা **'পরম্পরা'** (১৯৬২ সাল) উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক প্রস্ফুটিত করেছেন। 'পরম্পরা' প্রথমে নভেলেট হিসাবে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে উপন্যাস আকারে এটি আত্মপ্রকাশ করে। লেখক রচনাটি উৎসর্গ করেছেন – দীপেন্দু চক্রবর্তী মহাশয়কে।

আলোচ্য উপন্যাসে দুই প্রজন্মের অন্তর্গত দুটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারী চরিত্রের সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ চিত্রিত হয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। উক্ত দুই পুরুষ পরস্পরে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে আবদ্ধ। উপন্যাসের কাহিনীধারা থেকে প্রাপ্ত এই প্রধান তিনটি চরিত্রকে তাদের বয়স অনুযায়ী বড় থেকে ছোট সাজালে দাঁড়ায় – প্রফুল্লবাবু (পঞ্চাশের কাছাকাছি), নায়িকা - শিপ্রা (কুড়ি থেকে একুশ) এবং পিলু (আঠারো থেকে উনিশ)। এই অসম বয়সের অধিকারী দুটি মানুষের সঙ্গে একটি নারীর সম্পর্কের স্বরূপ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ঋতুচক্রের তুলনা করা যায়; – কালের নিয়মে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যখন সেজে ওঠে তখন তার রূপ-রসকে প্রাণীজগৎ আস্বাদন করে, পরের বছর সেই একই সৌন্দর্যকে আর এক ভাবে তারা গ্রহণ করে। ঠিক তেমনিভাবেই যেন নায়িকা – দুই বসন্তের স্বরূপ দুটি মানুষের কাছ থেকে আপন সত্তার চাহিদাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূরণ করেছে। এই দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে শিপ্রার ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করেছে। অথবা বলা যায়, তাদের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক তার পরম্পরা বজায় রেখেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রফুল্লবাবুর মত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি ও নায়িকা শিপ্রার মধ্যে যে সম্পর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায় – আমরা দেখি, শৈশব থেকেই শিপ্রা বাবা সতীকান্তবাবুর কঠোর অনুশাসনে মানুষ। তার স্নেহ ও বাৎসল্য রসের আধিক্য চার সন্তানের মধ্যে শিপ্রার প্রতি অনেক বেশি আরোপিত। ফলত এই কন্যা সন্তানটিকে ঘিরে তার অধিকার বোধও প্রবল। তাই তাকে প্রতিনিয়ত আপন বলয়ে আবদ্ধ রাখবার তীব্র প্রচেষ্টাই তার মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, বাবা-মায়ের স্নেহপ্রীতির অতিরিক্ত বর্ষণ কখনো কখনো সন্তানদের পক্ষেও অসহণীয় হয়ে ওঠে। শিপ্রার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

বাবার এই সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল বাসনা তার মনে জাগরিত হয়। বাবার রচিত সমস্ত বিধি-নিষেধ-নিয়ম ভেঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক তীব্র প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। তার এমন মনোভাব রচনাতে ধরা পড়ে এইভাবে – "আত্মসম্মান যার একবিন্দু আছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, সে এখানে বাস করতে পারে না। যে বাপের শিষ্টাচার শোভনতা জ্ঞান নেই, যে বাপ আগাগোড়া শুধু ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা আর ঈর্ষা দিয়ে ভরা শিপ্রা তাকে দরকার হলে অর্থ সাহায্য করবে, কিন্তু শ্রদ্ধা কখনও করতে পারবে না।"[৭৮] এমন এক পরিস্থিতিতেই প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে শিপ্রার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রফুল্লবাবুর রুচি, মানসিকতা, ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধতা সর্বোপরি তার সৌম্য শান্ত প্রতিমূর্তির প্রতি শিপ্রা আকৃষ্ট হয়। একদিকে বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করবার অদম্য ইচ্ছা, অপরদিকে এই আকর্ষণ – এ দুইয়ের সংমিশ্রণই শিপ্রাকে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তারা পরস্পরে ছিল সহকর্মী। সেই সূত্র ধরেই তাদের বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীরতা লাভ করে। কিন্তু সেখানে সতীকান্তবাবু মধ্যস্থতা করেন। শিপ্রার ও প্রফুল্লবাবুর উভয়ের প্রতি দুর্বলতার বিষয়টি সতীকান্তবাবু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রফুল্লবাবু শুধুমাত্র শিপ্রার জন্যই এ বাড়িতে এলেও সতীকান্তবাবু দাবা খেলার অজুহাতে তাকে তিনি নিজের কাছে আটকে রাখতেন। শুধু তাই নয়, শিপ্রা যে প্রফুল্লবাবুর মেয়ের বয়সী বা মেয়ের মত – এ কথা তাকে সর্বদা স্মরণ করাতেন এবং সেই সঙ্গে শিপ্রার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতেন। স্বাভাবিকভাবে এ বিষয়টি শিপ্রার কাছে ছিল আরও যন্ত্রণাদায়ক। সে অনুভব করে – বাবা তার কাছ থেকে প্রফুল্লবাবুকেও কেড়ে নিতে চান। সুতরাং আমরা লক্ষ করি, সতীকান্তবাবুর প্রতিরোধ যত দৃঢ় হয়েছে বিপরীত পক্ষের প্রতি শিপ্রার আকর্ষণও তত তীব্র হয়ে উঠেছে।

যদিও তাদের ভালোবাসা ছিল অব্যক্ত অর্থাৎ না বলা কথার ব্যঞ্জনায় আভাসিত, যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র পরস্পরের চোখে চোখে তারা খুঁজে পেত। যার স্পর্শে মনের সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছিল এবং এর সৌরভ মনোজগৎকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় প্রফুল্লবাবুকে প্রাণ হারাতে হয়। শিপ্রার শরীরকে স্পর্শ না করেও তার অপবাদ দিয়ে সমাজ তাকে এই জীবন-সংসার থেকে চিরতরে বিদায় করে। অপরদিকে দেখা যায়, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিপ্রা তার ভালোবাসার মানুষটির স্মৃতিকে সঙ্গী করে বাকী জীবন অতিবাহিত করবার সংকল্প করে এবং সেই সূত্র ধরেই সে তার সত্তাকে শুধুমাত্র প্রফুল্লবাবুর নামেই উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা জানি, মন ও শরীরের সমষ্টিতেই একটি সত্তার পূর্ণবিকাশ সাধিত হয়। দুটি বিষয়েই সমান চাহিদা বর্তমান। কাজেই বলা যায়, প্রফুল্লবাবুকে কেন্দ্র করে

শিপ্রার মনোগত চাহিদা পূর্ণতা লাভ করলেও তার শারীরিক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। আর ঘটনাক্রমে তখন প্রফুল্লবাবুর অবিকল প্রতিমূর্তি হিসাবে তার আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে পিলু শিপ্রার জীবনে অনুপ্রবেশ করে। আসলে প্রফুল্লবাবুর সম্পূর্ণ প্রটোটাইপ হিসাবে পিলুকে গড়ে তোলার মূলে লেখকের এক বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল। ফলশ্রুতিতে সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে শিপ্রা পিলুর মধ্যে প্রফুল্লবাবুর সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিল। পিলু যেন তারই প্রতিবিম্ব। তারা যেন একটি মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। শিপ্রার কাছে এই দুই সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠে। ফলে শিপ্রা তার সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। প্রফুল্লবাবুর প্রতি তার মনের যে কামনা-বাসনা ছিল যা সে স্পষ্ট ভাষায় দাবী করতে সংকোচ বোধ করেছিল তা যেন পিলুর মাধ্যমে আদায় করতে মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কারণ পিলু যেন প্রফুল্লবাবুরই অপ্রকাশিত আর এক রূপ। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পিলুকে কেন্দ্র করে মনের এই আকাঙ্ক্ষা কখন যেন শিপ্রাকে তার সেই পূর্বকৃত অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত করে। তাই কাহিনীসূত্রে দেখা যায়, পিলুর উপস্থিতি শিপ্রার মনে আনন্দ বয়ে আনে। পিলুর ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় সামান্য প্রতিবাদ করলেও শিপ্রা মনে মনে বিষয়টিকে উপভোগ করে। তার শরীরের স্পর্শকে চিরন্তন করে রাখতে চায় বলেই শিপ্রা পিলুর শরীরের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে চলে। তার এই স্পর্শানুভূতি এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে – "স্বপ্নে যা ঘটে তার ওপর তো মানুষের কোনও হাত থাকে না। ..... নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশে থাকে না নিজের। এও যেন তেমনি। কিন্তু একে ঠিক অবিমিশ্র ভয় বলা চলে না। সেই সঙ্গে আরও যেন কী আছে। কঠিন শাসনে এতদিন যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল শিপ্রা সে যেন কোন পরম কৌশলে সব বন্ধন খুলে বেরিয়ে এসেছে। শিপ্রার মনে হল – শুধু আজই যেন নয়, অনন্তকাল ধরে এমনি করে সে একজনের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। এর সবখানিই অখণ্ড বর্তমান। এর অতীতও নেই ভবিষ্যৎও নেই। শুধু এক তীব্র অনুভূতির মধ্যে সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখা। শিপ্রা কোনওদিন নেশা করেনি। এরই নাম কি নেশা ? সান্নিধ্যের মাদক রসের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে কি সব ভুলে থাকা যায় ?"[৭৯] অর্থাৎ সত্তার বাকী অপূর্ণ আবেগ তথা শারীরিক চাহিদা পূর্ণ করবার আশায় শিপ্রা যেন লালায়িত হয়ে ওঠে।

অপরদিকে আঠারো  বছর বয়স মানে দুর্বার কিছু করে দেখানোর মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে জানান দেওয়া। পিলুও প্রাথমিক অবস্থায় বাবার সত্তাকে উপলব্ধি করে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবার সংকল্পেই সে শিপ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার মনের সেই বোধ বিলীন হয়ে যায়। সে তার আপন সত্তাকেই বড় করে দেখে। আপন কামনা-বাসনা পূর্ণ করবার

প্রবণতাই তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। কেননা, পূর্ণ যৌবনে অবস্থানরত পিলুর শরীর নানা ইঙ্গিত প্রেরণ করতে থাকে। বিপরীত এক শরীরের মোহ তার শরীরকে আবিষ্ট করে রাখে। জীবনের এই সত্য দিকটি পিলুও শিপ্রার সামনে মেলে ধরে –".... তোমাকে দেখে নিজের দেহের কথা তার মনে পড়ল। নিজের শরীর সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল। সে কী যন্ত্রণা! আর কী আনন্দ! আর সেই সঙ্গে লজ্জা। একটি দেহ কেন আর একটি দেহকে এমন করে টানে ? সে তার নিজের দেহ নয় বলে ? নিজের নয় বলেই কি এমন একান্তভাবে নিজের করে নিতে ইচ্ছে হয় ? নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্তমাংস, মেদ-মজ্জার সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে সাধ যায়। আবার সমস্ত শরীর নিয়ে শরীরের এই প্রবল প্রবৃত্তির জ্বালা নিয়ে প্রখর অগ্নি প্রবাহের মধ্যে প্রচণ্ড বন্যাপ্রবাহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃশেষে নিজেকে বিলোপ করে দেওয়ার যে ইচ্ছা জাগে সে ইচ্ছাও তো এই শরীরেরই।"[৮০] সুতরাং পিলু ও শিপ্রার আকাঙ্ক্ষা যখন একই জায়গায় তখন তারই বশবর্তী হয়ে গভীর আবেগে তারা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ করে। আর তখনই শিপ্রার মনের সংস্কার ও বিবেকবোধ প্রফুল্লবাবুর কণ্ঠ গ্রহণ করে, এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় – "তুমি এই! এই তোমার নিষ্ঠা, এই তোমার কৃতজ্ঞতা। আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিলাম। আর তুমি তার বদলে কী দিলে ? আমার ওই একফোঁটা ছেলেকে তুমি তার আত্মীয়স্বজন সবাইয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলে!"[৮১] এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কৃতকর্মের অনুশোচনায় আর্তস্বরে শিপ্রা জানিয়ে দেয় –"প্রফুল্লবাবু! আমার কোন দোষ নেই প্রফুল্লবাবু। আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনি। আর কাউকে না, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে না।"[৮২] কিন্তু যা চিরন্তন শাশ্বত তাকে অস্বীকার করবার শক্তি আমাদের কারও নেই। সেখানে বিবেক যতই কড়া শাসন করুক না কেন শিপ্রার পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। আমরা যদি ধরি, প্রফুল্লবাবুর মাধ্যমে শিপ্রার মন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাহলে বলতে হয়, পিলুকে কেন্দ্র করে তার শারীরিক চাহিদা পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এই দুটি মানুষকে ঘিরে শিপ্রার ভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং প্রফুল্লবাবু ও পিলু মিলেই একটি সম্পূর্ণ সত্তা গঠিত হয়েছে। আর তা বোঝানোর জন্য বা এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যেই লেখক পিলু চরিত্রটির মৃত্যু ঘটান। একটি সম্পর্কে ভিত্তিমূল আসলে কীভাবে গঠিত হয় তাই লেখক এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে এখানে উপস্থাপন করেছেন। মানব-মানবীর সম্পর্ক এইভাবে গড়ে ওঠে এবং একটি অপূর্ণ সম্পর্ক এইভাবেই বোধহয় পর্যায়ক্রমে পরম্পরার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে যখন ভালোলাগা তথা ভালোবাসা গড়ে ওঠে তখন তা থেকে পরস্পরের প্রতি তীব্র অধিকারবোধ ও অভিমান জন্ম নেয়। এই 'অভিমান' নামক অনুভূতিটি কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রগুলিকে বিশেষভাবে পরিচালিত করে। তাতে দেখা যায়, চরিত্রের অন্তর্লোক এক কথা বললেও বহিঃলোক ভিন্ন আচরণ করে থাকে। আর এর প্রতিক্রিয়া যে একটি সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে তা খুব স্বাভাবিক। এরকম একটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর **'দ্বৈতসঙ্গীত'** উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। অভিমান তথা অধিকারবোধকে একটি সম্পর্কের নিয়ামক হিসাবে লেখক এখানে কীভাবে ব্যবহার করেছেন এবং পরিণতি কি টেনেছেন তা দেখে নেওয়া যাক।

কাহিনীধারায় প্রবেশ করবার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ্য, সূচনালগ্ন থেকে ভালোবাসার অনুভূতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। সূচনা পর্বের সেই তীব্রতা পরবর্তী পর্যায়ে আপাত দৃষ্টিতে নেই বলে মনে হলেও, আসলে এর গভীরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তার খবর মনের কুঠুরীতে সর্বদা পৌঁছোয় না। বিশেষ পরিস্থিতির সাপেক্ষে বা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এর প্রভাবেই একটি সম্পর্ক আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক নিম্ন মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন অভাব যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, জীবনধারা থেকে দুটি প্রধান চরিত্রকে তুলে এনেছেন। অর্থাৎ এখানে নায়ক-নায়িকা সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে একই বলয়ের অন্তর্গত। তাদের পারিবারিক অবস্থা, রুচি-মানসিকতা এবং জীবনে বেঁচে থাকবার স্বপ্নগুলি প্রায় একই। দেখা যায়, মফঃস্বল শহরের একটি কলোনীতে পাশাপাশি বসবাস করবার সুবাদে এবং সমাজ কল্যাণের সমবেত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। তাদের সম্পর্ক স্থাপনের দশ বছর পর একটি পর্যায় থেকে লেখক এই উপন্যাসের কাহিনীজাল বয়ন করেছেন। সেখানে আমরা লক্ষ করি – পরিবারের বড় সন্তান হিসাবে নন্দাও তাদের অভাবের সংসারের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। সে সকাল-সন্ধ্যা টুইশন করে এবং দুপুরবেলা কলোনীর একটি স্কুলে পড়ায়। নন্দা ছাড়া পরিবারে আছে বাবা-মা, অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত বোন দীপ্তি এবং আরও ছোট ছোট দুই ভাই-বোন। অপর দিকে কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র চিত্তও সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজে বহন করে চলেছে। পরিবারে বাবা-মা, বিধবা বোন এবং দুই ভাগনে-ভাগনির ভরণ-পোষণ তার উপরেই ন্যস্ত।

দুই পরিবারেই অর্থগত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এই নন্দা চরিত্রটি ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখে। মনের মানুষকে নিয়ে একটি দাম্পত্য জীবনের কল্পনায় সে বিভোর হয়ে থাকে। আসলে,

বাহ্যিক ক্ষেত্রে যতই প্রতিবন্ধকতা থাকুক না কেন, বিশেষ আবেগানুভূতির বশেই মনের কোণে নানা ইচ্ছেরা এসে ভিড় করে ওঠে। প্রতিটি যুবক-যুবতীর মনের ক্ষেত্রেই বিষয়টি ভীষণ স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়া করে থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নন্দা তাদের দুজনের সামর্থ অনুযায়ী স্বপ্ন গড়ে তুলেছে। তবে উচ্চবিত্তের বিলাসিতা যে নন্দাকে আকর্ষণ না করে তা নয়। এপ্রসঙ্গে লেখক নন্দার মনোভাব একঝলকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন –"নতুন পাড়া, নতুন নতুন সব দোতলা, তিনতলা বাড়ি। কত নতুন নতুন সব ডিজাইন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আবার ঈর্ষাও জাগে, লোভও হয়। এধরণের বাড়িতে নন্দাদের কোনও দিন হয়তো আর থাকা হবে না। মানুষ যে কী করে এত বড়লোক হয় আশ্চর্য।"[৮৩] তবে কাহিনীর আরম্ভে লেখক নন্দা চরিত্রকে খানিকটা রহস্যের আবরণে রাখবার উদ্দেশ্যেই নায়িকার এমন মনোভাবকে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাহিনীর অগ্রগতিতে নন্দার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অপরদিকে নায়ক চিত্তও হয়তো তার মতো করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। তবে এই চরিত্রটির যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তাতে বলা যায় – চিত্ত নন্দাকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও পরিবারের বাইরে গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তার দায়িত্ব গ্রহণে সে ভয় পায়। নিত্য দারিদ্র্যতা সেই সঙ্গে বিধবা বোন ও ভাগনা-ভাগনির উপস্থিতিতে তাদের দাম্পত্য জীবনকে কতখানি সুখময় করে তুলতে পারবে সে বিষয়ে চিত্তর মনে সংশয় ছিল। তাই ঘরের অভাব ও নানা আনুষঙ্গিক কারণকে সামনে রেখে সে বিয়ের প্রসঙ্গ বার বার এড়িয়ে গিয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করেছে।

তবে স্বামী-সন্তান-সংসারের ভাবনা নারীর রক্তে মিশ্রিত। তাই চিত্তর যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নন্দার যে প্রতিযুক্তি তার মধ্য দিয়ে নন্দার প্রকৃত মনোভাব এবং ভালোবাসার অনুভূতিকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটিই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে – "কিন্তু বড় বাড়িতে থাকতে পারবে না বলে বেশি দুঃখ তেমন হয় না নন্দার। যে কোনও রকমের একখানি ঘর হলেই যথেষ্ট। মাথার ওপর একটু চালা, চারদিকে চারখানি বেড়া, দুটি কি তিনটি জানালা আর পায়ের নীচে শক্ত ভিত এই হলেই হয়। একেই সাজিয়ে গুছিয়ে দিব্যি বাসের ঘর করে তোলা যায়। যদি ভালোবাসা থাকে, সেই ভালোবাসাটাই আসল। আসলে মানুষ তো বাস করে তার মধ্যেই – ঘরের মধ্যে তো আর করে না।"[৮৪] দেখা যায় – এই বিষয়টি নন্দা আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভাবেই চিত্তকে বু ঝিয়েছে। কিন্তু চিত্ত বার বারই অবুঝ রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ক্রমশ চিত্তর এমন দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার দিকটি অপর দিকে ভালোলাগার মানুষটিকে সঙ্গী করে সংসারী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে

ঘিরে যে দুজনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করছিল তা আমরা পাঠককুল সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হই। আর এই দ্বন্দ্বকে আরও ইন্ধন জোগাবার উদ্দেশ্যেই ঔপন্যাসিক এখানে অম্বিকাবাবু নামে একজন প্রৌঢ় চরিত্রের অবতারণা করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এই চরিত্রটিকে একজন কামুক পুরুষ বলে মনে হলেও আসলে তিনি ছিলেন যৌবনের পূজারী। যৌবনকে ভালোবেসে ওর স্পর্শে তার মননকে সর্বদা সিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, লক্ষণীয়, চিত্ত এখানে অম্বিকাবাবুর আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বরূপকেই সত্য বলে গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিত্তশালী এই মানুষটিকে একজন লম্পট বলেই চিত্ত ধারণা পোষণ করে। আর এখান থেকেই কাহিনী ভিন্ন পথে বাঁক নেয়।

উপন্যাসের সূচনাতে লক্ষ করা যায় – নন্দার টুইশন যাওয়ার পথে চিত্ত যখন তাকে পেছন থেকে ডাকে তখন নন্দার মনে হয় – "দশ বছর ধরে এই কণ্ঠ সে শুনে আসছে। কিন্তু এখন আর সবসময় এই স্বর তাকে উচ্চকিত করে না, উল্লাস জাগায় না।"[৮৫] তবে আমরা জানি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবেগানুভূতির সেই প্রথম পর্বের তীব্রতা আজ নন্দা উপলব্ধি না করলেও, চিত্তর এই ডাক সর্বদা তেমন উল্লাস না জাগালেও, আসলে, এই ডাকেই নন্দার স্বস্তি। এই ডাকই সে সারাজীবন কামনা করে। এর ব্যতিক্রমকে সে কখনোই গ্রহণ করতে পারবে না। যদি তা ঘটে তবে তার জীবন ও মনন তীব্রভাবে আলোড়িত হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়; এই পর্বে তাদের ভালোবাসা বিস্তৃত হয়ে গভীরে প্রবেশ করেছে। এ খবর হয়তো সর্বদা প্রকট হয়ে তবে এর অস্তিত্ব গভীরভাবে বর্তমান। তাই চিত্ত যখন নন্দাকে ডেকে অফিস শেষে দেখা করবার কথা জানায় তখন নন্দা মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মাসের শেষে উভয়ের হাতের অবস্থার কথা ভেবে সে অম্বিকাবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে গেলে তিনি একশ টাকার একখানা নোট দেন। লক্ষ করা যায় – নন্দার কাছে এত টাকার উৎস সন্ধানে চিত্ত যখন অম্বিকাবাবুর নাম শোনে তখন তার মনে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহের দানা বাঁধে। তার আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হয়, এক ঈর্ষাবোধ তাকে দগ্ধ করে। এর সমান্তরালে নন্দার প্রতি তার এক তীব্র অধিকারবোধ জেগে ওঠে। এই অনুভূতির বশবর্তী হয়েই নন্দার প্রতি তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ চিত্ত অকপটেই স্বীকার করে নেয় – ".....তোমার কোনও ভয় নেই। আমি যখন সঙ্গে আছি তোমার কোনও ভয় নেই নন্দা। সব দায়িত্ব আমার।"[৮৬] আসলে, চিত্তর মুখে এই প্রথম দায়িত্বের কথা শুনে নন্দা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। 'সব দায়িত্ব চিত্তপ্রিয়ের নিজের' – এ কথায় নন্দার মনে হয়; এত স্পষ্ট করে, এত দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ এত মধুর করে চিত্ত যেন আর

কখনও বলেনি। তাই সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। একান্তভাবে নিজেকে চিত্তর প্রতি সমর্পণ করে দেয়। 'দায়িত্ব' এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নন্দার মনোলোকের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ লেখকের কলমে উঠে আসে এইভাবে – ".....দায়িত্ব কথাটা চিত্ত এই প্রথম উচ্চারণ করল। এই কঠিন শব্দটা কী মধুরই না শুনিয়েছে আজ। শুধু শব্দটাই কঠিন নয়, ওর অর্থটাই তাই। চিত্ত তো জানে না এই শব্দটা পুরুষের মুখে কত মানায়। আর জীবনে এই শব্দকে অর্থদান করা যেন একান্ত অনুরাগিণী কোনও কুমারী মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার মতই পরম সুন্দর আর শুভ অনুষ্ঠান। চিত্ত কি জানে না পুরুষ দায়িত্ববান হলেই সুপুরুষ হয়, বীরপুরুষ হয়, যথার্থ পুরুষের মতো পুরুষ হয়ে ওঠে। এতদিন যদি জেনে না থাকে চিত্ত আজ নিশ্চয়ই জেনেছে। নন্দাকে পরিপূর্ণভাবে পেয়ে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই আজ সেই পুরুষচিত্ত জেগে উঠেছে।"[৮৭] অর্থাৎ, বলা যায় – চিত্তর ঐ একটি কথার মাধ্যমে তথা স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে নন্দা যেন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুখানুভূতিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। বিয়ে হওয়া বা না হওয়া এক্ষেত্রে গৌণ হয়ে ওঠে। আর তাই সে এতদিনের সংযমের বাঁধনকে মুক্ত করে দিয়ে, এক অবর্ণনীয় নব অনুভূতি আস্বাদনের মাধ্যমে নিজেকে ভিন্ন রূপে খুঁজে পায়। এই পাওয়াকে কেন্দ্র করে নন্দার মনের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা বাড়ি ফিরে এসে তার নানা ব্যতিক্রমী আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রস্ফুটিত হতে দেখি।

তবে, নন্দা নবলব্ধ এই অভিজ্ঞতাকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করে ওরই স্মৃতিগন্ধে বিভোর হয়ে থাকলেও চিত্ত কিন্তু ঐ একই আবেগে ভেসে যেতে পারেনি। একটি বিশেষ মুহূর্তে এক বিশেষ অনুভূতির বশবর্তী হয়ে সে নন্দাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই অনুভূতি বিলীন হয়ে গেলে দায়িত্ব গ্রহণের দিকটি তার কাছে অনেক বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আসলে, উপন্যাসের এই চরিত্রটির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। তাই সে নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজের প্রতি আস্থা না থাকার দরুণ, আবেগের বশে নেওয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে কিনা তা নিয়ে সে সর্বদা আশঙ্কাগ্রস্ত থাকে। ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায় – তার আশঙ্কা সত্য বলেই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ নন্দা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। আমরা পাঠকবর্গ হয়তো সকলেই একমত যে চিত্তর মত মানুষেরা প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নিজেকে দায়ী না করে অন্যের উপরেই দায়ভার চাপিয়ে দেবে। সেই অনুযায়ী দেখা যায় – চিত্ত ও নন্দার কথোপকথন উঠে আসে, চিত্ত একটু লজ্জিত হয়ে জানায় – "হ্যাঁ, সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। কিন্তু তুমি কি

বলতে চাও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেদিন তোমার ওপর .....।"[৮৮] এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যখন নন্দা জানায় –"ছিঃ তা কেন ? এ-কথা জেনে রেখো আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না। তুমিও পারো না, আর কেউ পারে না।"[৮৯] এক্ষেত্রে চিত্তর মনের কোণে যে গুঞ্জন ওঠে – "সে লক্ষ করল নন্দা সবসময় বহুবচনে কথা বলছে। একটি পুরুষের কথা বলছে না, বহু না হোক অন্তত দুটি পুরুষের কথা নিশ্চয়ই ও মনে রেখেছে। যত অস্বাভাবিকই হোক, অম্বিকাবাবু তাঁর গাড়ি-বাড়ি আর বিপুল বিষয় সম্পত্তি নিয়ে প্রবলভাবে নন্দার মনে উপস্থিত। আসলে মেয়েরাই বস্তুবাদিনী। বস্তু ছাড়া তাদের চলে না। সংসারে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নী মৈত্রেয়ী আর ক'জন ? অম্বিকাবাবু তাঁর ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি দেখিয়ে নন্দার মনে এক অশুভ মোহের সৃষ্টি করে রেখেছেন। বয়স এখানে একটা ফ্যাক্টরই নয়। বয়সের হিসাব আসে যখন একজন আর একজনকে বিয়ে করে। কিন্তু বিবাহ বহির্ভূত অনেক সম্পর্ক থাকতে পারে যেখানে বয়সের হিসাব অবান্ত র।"[৯০] অর্থাৎ বলা যায়, একটি সংশয় মনের কোণে তার জমে উঠেছে। সেই সঙ্গে বলতে হয় – যে মানুষটি একজনের ভরণ-পোষণ করতেই ভীত-সন্ত্রস্ত, তার কাছে অন্তঃসত্ত্বা নারীর দায়িত্ব গ্রহণ যে মস্ত বড় বিড়ম্বনার শামিল তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সে স্বাভাবিক ভাবেই এই অবাঞ্ছিত সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিপক্ষে। অপরদিকে নন্দার কাছে এ মাতৃত্ব লাভ তার ভালোবাসার স্মারক চিহ্ন স্বরূপ। সেই চিহ্নকে সে পৃথিবীর আলোয় আলোকিত করতে বদ্ধপরিকর। কাজেই, তাদের মতাদর্শের এক বিস্তর পার্থক্য এখানেই সূচিত হয়ে যায়। এখান থেকেই তাদের সম্পর্কের জটিলতা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। লেখকের জবানীতেই সেই পার্থক্য ধরা পড়ে – "নায়ক-নায়িকার মিলনের জায়গা আমরা একই রেস্টুরেন্টে রেখে দিচ্ছি। .....কিন্তু স্থানকাল মোটামুটি একরকম থাকলেও পাত্র-পাত্রীর মানসিক অবস্থা একরকম রইল না। তা ঘন ঘন বদলাতে লাগল।"[৯১]

ঘটনাক্রমে লক্ষণীয়, নন্দা এই সমস্যার সমাধান হিসাবে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলে চিত্তর মানসভূমি যেভাবে আলোড়িত হয়, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ – "অন্য সময় হলে লজ্জিতা বিব্রতা আশ্রিতা নির্ভরশীলা তরুণী নারীর অপরূপ সৌন্দর্য্য চিত্ত দেখতে পেত, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কিছুই পেল না। বিয়ের জন্য সে তো এখনই তৈরী হয়নি। বিয়ে মানে প্রচন্ড বার্ডেন। সে এক বিভীষিকার শামিল। তাছাড়া পারিবারিক সমস্যা ক্রমেই জটিল হচ্ছে। দিদির উৎপাত ক্রমেই বাড়ছে। .....বাবা বাতে পঙ্গু হতে চলেছে। মা'র মেজাজ ক্রমেই তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। .....দুর্ভাগ্যের আর শেষ নেই। এর মধ্যে কি শুভবিবাহের আনন্দ-উৎসবে সাধ যায় ? ঘর নেই, বাড়ি নেই। জবর-দখল কলোনির মধ্যে পড়ো পড়ো এক পর্ণকুটির। সেখানে কোথায় সে স্ত্রীকে

নিয়ে তুলবে ? বিয়ের আগেই যে মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বসে আছে তাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে ? তাও যদি অর্থবল থাকত তা হলেও হত।"[৯২]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এক অস্থির মানসিকতা থেকে উৎপন্ন তীব্র ক্রোধকে কণ্ঠে জড়িয়ে চিত্ত জানায় – "বিয়ে তো আমি এমনিতেই করতাম। দু'দিন আগে আর পরে। তার জন্যে এমন করে ফাঁদ না পাতলেও পারতে নন্দা।"[৯৩] এতদিনের সম্পর্ক, এত চেনা মানুষটির এমন তীক্ষ্ণ শ্লেষ নন্দাকে যে স্তব্ধ করে তুলবে তা স্বাভাবিক। তাই দগ্ধ চিত্তে তার এই প্রতি-উত্তর –"তুমি কি ইতর। সেমলেস, ব্রুট। ....আজ তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু সেদিন কি তুমি নিজেই জোর করে –"[৯৪] এর পরিপ্রেক্ষিতে চিত্তের বিকৃত মানসিকতার প্রতিফলন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে –"আমি জোর করবার আগে আর কারও মধুর জবরদস্তি তুমি যে সহ্য করোনি তার কি কোনও প্রমাণ আছে ? তুমি যে আর কারও কুকীর্তি আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ না তার কী প্রমাণ তুমি দিতে পারো ?"[৯৫] এই কথোপকথনের দিকে তাকিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, তাদের সম্পর্ক সংকটের কোন্ চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে।

সেই সঙ্গে আর একটি দিকও লক্ষ করা যায় – দোলাচল অস্থির চিত্তের অধিকারী এই নায়ক চরিত্রটি তার আপন প্রতিক্রিয়ায় খানিকটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তাই তার এমন বিরূপ আচরণে নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননার যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে নন্দা যখন বেরিয়ে যায়, পরক্ষণে চিত্তও খোঁজখবর করে যে, নন্দা সুস্থ-স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি ফিরতে পেরেছিল কিনা। অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মে বিচলিত হয়েই এমন আচরণ করেছিল। আর তার এই অনুশোচনাকে আরও গভীরতা দান করেছিল যখন নন্দার বাবা নিজে উপযাজক হয়ে নন্দার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি দিক উল্লেখ করতে হয়, যদিও এর আগে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছি যে – ভালোবাসার অনুভূতি যখন বিস্তৃত, স্ফীত হতে হতে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছে যায় তখন তার অস্তিত্ব সর্বদা ধরা পড়ে না। বিশেষ মুহূর্তে তার স্ফূরণ ঘটে। আলোচ্য উপন্যাসের এই পর্বে উপস্থিত হয়ে চিত্তর হৃদয়ভূমিতে ঐ বিশেষ অনুভূতির প্লাবন ঘটে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত বাধ্য-বাধকতা গৌণ হয়ে ওঠে। তার সেই চিরন্তন তথা শাশ্বত ভাবাবেগ তাকে আপন দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাই একান্ত কাছের মানুষটিকে আরও আপন করে নিতে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তবে কথাকার যে উপাদানে নন্দা চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন সেই অনুযায়ীই নন্দা তীব্র অভিমানে অহংবোধে জানিয়ে দেয় – তার এই অবস্থার

জন্য চিত্ত দায়ী নয়। লক্ষ করা যায় – এই বিষয়টিও চিত্তকে আহত করে, সে বিশ্বাস না করলেও সমান্তরালে খানিকটা আশঙ্কা তার থেকেই যায়। কাহিনীর প্রবাহমানতায় দেখা যায় – সেই আশঙ্কা যখন অম্বিকাবাবুর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় তখন চিত্ত অনুতপ্তে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বলা যায়; গভীর ভালোবাসা থেকেই তীব্র অধিকারবোধ জন্ম নেয়। আর এই অধিকার বোধের সঙ্গেই হয়তো অদৃশ্যভাবে সম্পৃক্ত থাকে সন্দেহের আবহ। তা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে নিরসন হয় না। ঘটনাক্রমে পরিলক্ষিত হয় – শেষ পর্যায়ে এসে চিত্ত তার সন্তানের স্বীকৃতি সহ নন্দাকে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করে। দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যেও যে একরকম আনন্দ আছে, তা এই প্রথম চিত্ত অনুভব করে। তারই উচ্ছ্বাসে সে ভেসে যায়। তবে নন্দার মনের কোণে কোথায় যেন সংশয় রয়ে যায় – চিত্ত পুনরায় আবেগের বশে কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি তো ? কিন্তু, নানা প্রশ্ন, আশঙ্কাকে সঙ্গী করেই নন্দাকেও চিত্তের উচ্ছ্বাসেও ভেসে যেতে হয়। যে উত্তরগুলি সময়ের কাছে, ভবিষ্যৎ -এর কাছে তোলা রয়ে যায়। কেননা, 'দ্বৈতসঙ্গীত'-এ সর্বদা যে তাল-লয়ের সামঞ্জস্য থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বলা যায় না পরিস্থিতির সাপেক্ষে মানুষের মনের অবস্থা একই মাত্রায় স্থিত থাকবে কিনা। মানব-মানবীর সম্পর্ক এইভাবে যে নানা চড়াই-উৎরাইকে সঙ্গী করে বাহিত হয়ে থাকে, তারই একটি দৃষ্টান্ত ঔপন্যাসিক এই 'দ্বৈতসঙ্গীত' উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

নর-নারীর সম্পর্কের রূপের ভিন্নতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হলেও এই উপন্যাসের কয়েকটি দিক উল্লেখ না করলেই নয়, যেমন – নন্দার বোন দীপ্তি। সে একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ। অর্থাৎ বয়সের সঙ্গে তার শরীর সামঞ্জস্য করে না বৃদ্ধি পেলেও সর্বোপরি সেও একজন মানুষ। তারও মন আছে। আর আছে সেই মনে নানা চাহিদার সম্ভার। লেখক দু'একটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের গভীর দিকটি এখানে প্রস্ফুটিত করেছেন। সে মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই সেলাই মেশিনে ছেলেদের প্যান্ট-শার্ট তৈরী করতে বেশি পছন্দ করে। শুধু তাই নয়, দীপ্তি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাগের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকলেও দিদি যখন চিত্তদার সঙ্গে দেখা করতে যায় তখন সে তার প্রিয় শাড়িখানা দিদিকেই পড়তে দেয়। আসলে দিদির অভিসারের মধ্য দিয়ে সে আপন সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করে।

নারীর মনের এই দিকটি চিত্তর বিধবা বোনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রতিফলিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – চিত্ত কোন নারীকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করবে তা সে সহ্য করতে পারে না। শুধু তাই নয়, পাড়ায় কোন অবৈধ সম্পর্কের কথা শুনলে ঐ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা

করতে সে ভীষণ পছন্দ করে। আসলে, এর মূলেও তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণাই লুকিয়ে আছে।

অপরদিকে, অর্থকষ্টে জর্জরিত, নিম্নমধ্যবিত্তের বলয়ের অন্তর্গত মানুষের মানসিকতার একটি দিক ঔপন্যাসিক এখানে চিত্তের বাবার মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। যেখানে দেখা যায় – নন্দার বাবা চিত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে চিত্তের বাবা তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। কেননা, সে অবগত ছিল স্বীকার করা মানেই অর্থদণ্ড। শুধু তাই নয়, লক্ষ করা যায় সে ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিতেও উদ্যত। আর তার জন্য অগ্রিম টাকাও সে মেয়ের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করে নেয়। অর্থাৎ মানবিকতা নয়, বেঁচে থাকবার জন্য অর্থটাই বড় হয়ে ওঠে। এইভাবেই লেখক আলোচ্য উপন্যাসে কেন্দ্রীয় নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বরূপকে স্পষ্ট করে তুলবার উদ্দেশ্যেই এরকম বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে আমরা সম্পর্কের আর একটি দিককে অনুভব করলাম।

একটি সম্পর্কে কখনো কখনো সময় ও পরিস্থিতি সরে দাঁড়ায় ঠিকই কিন্তু সেই সম্পর্কে জড়ানো আবেগ, টানাপোড়েন থেকেই যায়। এক্ষেত্রে মানব-মানবীর মধ্যে মূলত যে প্রেমের তথা ভালোবাসার সম্পর্ক তা পরিণতি নাই বা পেতে পারে অথবা তা একপাক্ষিকও হতে পারে কিন্তু সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মনের অনুভূতি কখনো মিথ্যা হয় না, তা চিরন্তন ও শাশ্বত। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় মানব-চরিত্রগুলি পরিচালিত হতে থাকে। ঠিক তখনই আসে বৈধতা-অবৈধতা, নৈতিকতা ও বিবেকবোধের প্রশ্ন। তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে মানবিক চাওয়া-পাওয়াই বোধ হয় শেষপর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে। এমনই একটি দিককে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর **'সূর্যসাক্ষী'** (১৯৬৫ সাল) নামক উপন্যাসটিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

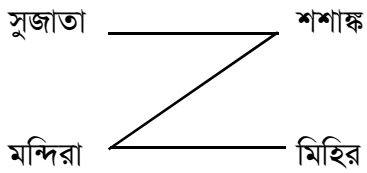


দুটি সরল এবং একটি তির্যক সম্পর্কের সমন্বয়ে আলোচ্য 'সূর্যসাক্ষী' উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। এখানে মূলত চারজন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঐ তিনটি সম্পর্ক আবর্তিত হয়েছে। দেখা যায়, একটি সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক দুটি বৈধ সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। ঐ সমাজ নিষিদ্ধ তথা তির্যক সম্পর্কের দুই প্রান্তে আছে দুটি অসম বয়সের নর-নারী; যথা – প্রৌঢ় এক

বিবাহিত পুরুষ শশাঙ্ক এবং কিশোরী নারী মন্দিরা। কাহিনীসূত্রে শশাঙ্ক চরিত্রটির যে মানসিকতা উঠে আসে তাতে দেখা যায় – তিনি প্রচলিত গতানুগতিক জীবন ধারণে বিশ্বাসী নন। প্রথার বাইরে গিয়ে জীবনকে চালিত করবার মধ্য দিয়েই তার আনন্দ। অর্থাৎ সমাজের বুকে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসাবেই নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর এই চাওয়ার পূর্ণতা দানের মধ্য দিয়েই তার পৌরুষত্বের বিকাশ সাধন ঘটে বলে তিনি মনে করেন। প্রথা ভঙ্গের হাতিয়ার হিসাবে তিনি তার যৌনক্ষুধাকে বেছে নিয়েছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন নারীর প্রতি আসক্তি লাভ এবং তাদের দেহজ মোহ আস্বাদন করবার মধ্য দিয়ে শশাঙ্ক যেন জীবনকে নতুন নতুন রূপে খুঁজে পেয়েছিলেন। আসলে পুরাতনের বিসর্জন এবং নতুনের আবাহন – তার এই নিয়মানুবর্তিতা পালনের মূলে ছিল আপন যৌবন ও যৌনসত্তাকে চিরন্তন করবার বিশেষ প্রয়াস। শুধুমাত্র বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করা নয়; তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ারও এক অদ্ভুত মত্ততা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে কোন ফলের আশা তার ছিল না। এই প্রসঙ্গে শশাঙ্কের মনোভাব কাহিনীতে প্রস্ফুটিত হয়েছে এইভাবে –"শশাঙ্কের যে মন অভিজ্ঞ আর প্রাজ্ঞ সে মন জানে এ নিতান্তই মোহ। এ প্রহেলিকা একান্ত করে তার নিজেরই রচনা। তবু আর এক মন সেই স্বরচিত মুগ্ধবোধে প্রমত্ত হয়ে থাকে। এই তীব্র বাসনা আর আসঙ্গ লিপ্সার মধ্যেই শশাঙ্ক যেন নিজের পুনর্জন্ম, নবজন্ম, নবযৌবনের স্বাদ পায়। দ্বিতীয় কোন স্বাদ তার কাছে বিস্বাদেরই নামান্তর।"[৯৬] অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, তার মনে মোহ আছে কিন্তু মায়া নেই। কাজেই এমন বোধকে যিনি জীবন চলার পথে প্রতিষ্ঠা করেছেন; তার কাছে একক নারীকেন্দ্রিক দাম্পত্য সম্পর্ক যে ঠুনকো হবে তা খুব স্বাভাবিক। তিনি দাম্পত্য জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। আর একরকম এক পরিস্থিতির সাপেক্ষে ও আপন স্বভাবগুণের তাগিদে তার সঙ্গে মন্দিরার পরিচয় ঘটে।

অভিজাত ও রক্ষণশীল পরিবারে লালিত মন্দিরার জীবনে দেখা যায় প্রথম পুরুষ হল শশাঙ্ক। তার মাধ্যমেই সে প্রথম যৌবনের অনুভূতি লাভ করে। অর্থাৎ বলা যায়, পূর্ণ যৌবনে অবস্থানকারী শশাঙ্কই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা মন্দিরার যৌন চেতনাকে জাগ্রত করেন এবং তার স্বাদ আস্বাদন করান। কাজেই মোহের বশবর্তী হয়ে মন্দিরা বার বার শশাঙ্কের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। প্রাথমিক পর্যায়ে মন্দিরার কাছে এই আকর্ষণ ছিল ভালোবাসারই নামান্তর। কেননা, এছাড়া অন্য কোন অনুভূতি লাভ করবার সুযোগ তার ঘটেনি। তবে ঘটনাক্রমে স্বাভাবিকভাবে এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিরুদ্ধে পরিবার যত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার আকর্ষণ তত দুর্বার হয়ে উঠেছে। অপরদিকে শশাঙ্ক চরিত্রটি নিজেকে যতই ব্যতিক্রমী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে

চান না কেন, সর্বোপরি তিনি একজন মানুষ। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই তার 'হৃদয়' নামক একটি বস্তু আছে। এর অবস্থান দেহের বাইরে নয়। আসলে 'মন' দেহেরই আর এক সংস্কার। দেহ ও মন একে-অপরের পরিপূরক; দুই -এর মিলনেই একটি সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। দুটি 'মন' যখন পরস্পরকে ছুঁয়ে যায় তখন সেখানে শরীর গৌণ হয়ে ওঠে। একটি হৃদয়ের সঙ্গে আর একটি হৃদয়ের মিলনের যে তীব্র আকূতি তা অবিনশ্বর, নিরাকার। সমগ্র জীবনব্যাপী সেই অনুভূতিকে দুটি মনোলোকই লালিত করে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে শশাঙ্ক জীবনে এই প্রথম মন্দিরা নামক নারী চরিত্রটির মাধ্যমে 'দেহ থেকে মনে' উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই বোধ হয়, যে মানুষটি প্রথা ভঙ্গের মাধ্যমে গতানুগতিকতার তালিকা থেকে নিজের নামটি লুপ্ত করতে চেয়েছিলেন, তার মনেও প্রশ্ন এসে জমাট বাঁধে – "কিন্তু কিছুদিন ধরে অন্য কথা মনে হচ্ছে শশাঙ্কের। স্পর্শে যে সুখ, সে সুখ দেহসান্নিধ্য ছাড়া চলে না। কিন্তু এমন আরও কিছু সুখ কি নেই, যা সান্নিধ্যের ওপর নির্ভর করে না ? যা সান্নিধ্য ছাড়াই স্পর্শানুভূতির মতো তীব্র স্বাদ এনে দেয় ? এরই নাম কি দেহাতীত ভালোবাসা ? এরই নাম কি মনে মনে ভালোবাসা ?"[৯৭] আসলে শশাঙ্ক তার এই মনান্তর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এমন পরিবর্তনে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তার মনেও মায়া আছে এবং তা থেকেই মন্দিরার প্রতি ভালোবাসা জাগরিত হয়েছে – একথা তিনি স্বীকার না করলেও এটাই চরম সত্য। তাই মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকেই তার সংশয় জাগে – "তবু যাকে সে ভালোবাসে, তাকে সে বাপের মতো পরের হাতে, বরের হাতে দিতেও ভালোবাসে, এই বোধ আজ কোথা থেকে এল শশাঙ্কের মনে, এ কি দীনতার সৃষ্টি ? যৌবনহীনতা ? সম্ভোগ কামনার ক্ষীণতা ছাড়া এর মূলে কি আর কিছু নেই।"[৯৮] এর মূলে যে আরও কিছু ছিল সে কথা শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ককে স্বীকার করতেই হয়। আর সে কারণেই হয়তো তিনি মনে মনে বলেছিলেন – "আপনার সঙ্গে আজ আমার আর কোনও তফাৎ নেই। আপনার মতো আমিও আজ আর শুধু ওকে চাই না, আমিও ওর সুখ চাই, শ্রী, সৌন্দর্য, পূর্ণতা চাই। আমি শুধু ওর দেহ চাই না। আপনার চেয়ে আমার কষ্ট কম নয়। আপনি অনেক পণ দেবেন, যৌতুক দেবেন, আর আমাকে দিতে হবে পৌরুষ। আমাকে খোয়াতে হবে আমার আইডেনটিটি। বৃদ্ধ বাপের চেয়ে প্রৌঢ় প্রণয়ীর ত্যাগ কম নয়, যোগরঞ্জনবাবু।"[৯৯] এখান থেকেই শশাঙ্ক ও মন্দিরার মধ্যে একদিন যে সম্পর্ক সূচিত হয়েছিল তা অন্য খাতে বিকশিত হতে থাকে। শশাঙ্কের মনোভূমির এমন রূপান্তর মন্দিরার পক্ষে উপলব্ধি করবার মত তখন তার বয়স, পরিস্থিতি ও সুযোগ কিছুই ছিল না। কাজেই আমরা লক্ষ করি, এমন এক কঠিন পর্বকে

সঙ্গী করেই মন্দিরা তার দাম্পত্য জীবনে তথা সমাজ স্বীকৃত বৈধ সম্পর্কে প্রবেশ করে।

কিন্তু যে নব-সংসারে পূর্ব থেকেই 'নষ্টনীড়' রচিত হয়ে যায় সেখানে কারও পক্ষেই দেহ-মন একত্রে সমর্পণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মন্দিরাও এ দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ফলত জীবন সেখানে যন্ত্র স্বরূপ। অপরদিকে আলোচ্য উপন্যাসে মন্দিরার স্বামী মিহিরকে একটি 'Type' চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী স্বাভাবিক আচরণ করেছে। মন্দিরার প্রতি জোর পূর্বক স্বামীত্বের অধিকার আরোপ করবার মাধ্যমে সে তার পৌরুষত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। আসলে মিহির তার জীবনের প্রথম নারী হিসাবে স্ত্রী মন্দিরাকেই পেয়েছিল। কাজেই সেও মন্দিরাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তা ছিল একপাক্ষিক এবং অনেক বেশি দেহজ মোহে আবৃত। আর তাই হয়তো মন্দিরার অতীত জীবন সম্পর্কে সে কখনো কখনো উদাসীন থেকেছে আবার কখনো অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। মিহিরের এই দ্বৈত ক্রিয়ায় মন্দিরার জীবন আরও বেশি দুঃষহ হয়ে উঠেছিল। তাই হয়তো 'নষ্টনীড়' -এর চারুলতার তুলনায় আরও একধাপ এগিয়ে এসে সমাজ সংসারের সমস্ত বিধি-নিষেধ, নৈতিকতা ও সংস্কারকে অতিক্রম করে মন্দিরা সেদিন পুনরায় শশাঙ্কের কাছে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে ক্ষয়িষ্ণু ভিত্তিস্তম্ভে মিহির ও মন্দিরার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা এই পর্বে এসে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।

তবে আমরা জানি – ভালোবাসা স্বয়ং একজন শিল্পী ও একটি শিল্প, যা সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। যার শুভ্রতা, স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্যের ছটায় বিপরীত পক্ষ শুধুমাত্র আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই নয়, গভীরতর ভালোবাসা বৃহত্তর ত্যাগেরও শিক্ষা দেয়। তা হৃদয়ানুভূতিকে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করে না রেখে তাকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় – এই বোধ শশাঙ্ক চরিত্রটির মর্মমূলে গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। তাই তিনি তার ভালোবাসাকে শুধুমাত্র দেহজ মোহে এবং সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে রাখতে চাননি। শুভ পরিণামের কথা ভেবে তথা মন্দিরার জীবনকে সৌন্দর্যে-সাফল্যে-কল্যাণে-সার্থকতায় পরিপূর্ণ করবার তাগিদে সেদিন যেমন শশাঙ্ক মিহিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন আজও তেমন সেই একই অর্থে মন্দিরাকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে তার মনের এই গোপন কথা অব্যক্তই রয়ে যায়। বরং তার এমন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দিরার মনে ভুল বার্তা পৌঁছোয়। কিন্তু শশাঙ্ক মানুষটির এমন মনোগত পরিবর্তন আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আমরা লক্ষ করি, মন্দিরাকে ভালোবেসেছিলেন বলেই শশাঙ্ক পরবর্তী সময়ে আর কোন নারীর প্রতি

আসক্ত হননি, শুধু তাই নয়, সে তার একমাত্র মানসী প্রতিমা হিসাবে মন্দিরার কোমল প্রতিমূর্তিকে আপন শিল্পসত্তা দিয়ে ক্যানভাসে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন। কাজেই তার অন্তর্লোকে এই যে বিশেষ অনুভূতির বিচ্ছুরণ তা সূর্যালোকের মতই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সময়ের ব্যবধানে ও পরিস্থিতির কষাঘাতে মন্দিরা যে অনেক বেশি পরিণত হয়ে উঠেছিল এর পরিচয় আমরা পাই – শশাঙ্কের স্ত্রী সুজাতার সঙ্গে তার কথোপকথন প্রসঙ্গে। লক্ষণীয়, সে সময় মন্দিরার পরনে ছিল গাঢ় সবুজ রং -এর শাড়ি, বিপরীতে সুজাতা সাদা খোলের শান্তিপুরী শাড়ির আবরণে আবৃত। আসলে লেখক এখানে প্রতীকী-ব্যঞ্জনায় বিষয়টিকে পরিবেশিত করেছেন। মন্দিরা সুজাতার প্রতিপক্ষ। একজন ভোগ-বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত, অপরজন ত্যাগের মহিমায় দীপ্ত। আসলে পূর্ণ যৌবনে অবস্থানকারী মন্দিরার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে তখনও কামনা-বাসনার উর্দ্ধে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কাহিনীসূত্রে ধরা পড়ে সুজাতাও একদিন মন্দিরার ঐ বয়সে ছিলেন। তিনিও স্বামী শশাঙ্ককে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। আর এই ভালোবাসা থেকে জাগ্রত অধিকারবোধে সুজাতা যতই স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন শশাঙ্ক ততই তার প্রতি উদাসীন হয়েছেন। স্বামীর এই উদাসীনতা ও ভিন্ন ভিন্ন নারীর প্রতি লিপ্সার বিষয়টি ছিল সুজাতার কাছে তার নারীত্বের অবমাননা-স্বরূপ। কাজেই আপন অস্তিত্বের সংকটে তিনি ক্রমশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। একপাক্ষিক ভালোবাসার ক্রিয়ায় শুধুমাত্র তিনি নিজে ছট্‌ফট্‌ করেছেন। সুতরাং একটা সময় দাম্পত্য জীবনকে ইতি টানতে সুজাতা বাধ্য হয়েছিলেন। লক্ষ করা যায়, সময়ের পার্থক্যে ভালোবাসার আগুন তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করে। যার স্বর্ণালী কিরণ আপন মনের ভোগ-লালসা-কামনার বিলুপ্তি সাধন করে তাকে অনেক বেশি পরিণত, শান্ত , সংযমী এক ভিন্ন সত্তা গঠনের সহায়তা করেছিল। সে সত্তা ত্যাগের ধর্মে ব্রতী হয়েছে, যার ভালোবাসা ঐ ত্যাগের মধ্যেই বিকশিত। তাই শেষ পর্যায়ে সুজাতা শুধুমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী হিসাবে ও কল্যাণ কামনায় শশাঙ্কের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু তার পরিবর্তে কোন প্রত্যাশা রাখেননি। অথবা বলা যায়, মনের গোপন কোণে কিছু আশা থাকলেও তা আদায় করবার সেই তীব্র মত্ততা আর তার নেই। শশাঙ্কের শুভ কামনায় সেটুকুও তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখানেই তার ভালোবাসার মাহাত্ম্য উন্মোচিত।

সমানভাবে এই ভালোবাসার যন্ত্রণায় মন্দিরাও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং এরই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায় আমরা লক্ষ করি – মন্দিরা একদিন সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে শশাঙ্ককে কেন্দ্র

করে গড়ে ওঠা মনের সমস্ত অভিমান, অনুরাগ ও ক্ষোভকে প্রকাশ করে। কিন্তু পরের দিন নতুন প্রভাত সূর্যকিরণে তার মনের সমস্ত অন্ধকার দিকের বিলোপ ঘটে। নিজের সত্তাকে আর একভাবে সে অনুভব করে। যদিও আমরা জানি, এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল মন্দিরার মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এসে স্বামী মিহিরের কাছে ছুটে গিয়ে শশাঙ্কের জন্য মুক্তি কামনার মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই তার ভালোবাসা ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। হয়তো শশাঙ্কের সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্য আর একটি স্তরে পদার্পণ করে। আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের হৃদয়ানুভূতি তথা প্রেমানুভূতি একটি স্তর থেকে উত্থিত হয়ে তা বিশ্বানুভূতিতে বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ তা Particular থেকে Universal -এ ধাবিত হয়েছে। এই বৃহত্তর ভালোবাসার দীপশিখা মনের সমস্ত দীনতা-হীনতা-মলিনতাকে দূরীভূত করে সমস্ত চরিত্রের 'মনোজগৎ'কে এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত করেছে। সূর্য যেমন রাতের আঁধার ঘুঁচিয়ে দিনের সূচনা করে তেমনই ভালোবাসার দীপ্তি মননকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং বলা যায়, 'সূর্যসাক্ষী' উপন্যাসে সূর্যের আলোক যেন ভালোবাসার আলোকেরই সাক্ষী। আর এরই প্রভাবে যেন সম্পর্কগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আর একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস হল – **'মৌন মাধুরী'** (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)। একজন বিবাহ-বিচ্ছিন্না রমণীর সঙ্গে একজন অবিবাহিত মূক পুরুষের সম্পর্ক স্থাপিত হলে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কিরূপ হয় – তারই নির্মাণ লেখক এখানে করেছেন।

এই উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে একটি 'নভেলেট' বা 'বড়গল্প' ছিল। এই ধরণের রচনাগুলিকে লেখক 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। 'মৌন মাধুরী' উপন্যাসটির প্রতি লেখকের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তাই এর কাহিনীকে বিস্তৃত করবার উদ্দেশ্যে ১৩৮০ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি অন্যান্য লেখার ফাঁকে ফাঁকে শ'খানেক পৃষ্ঠাও লিখে ফেলেছিলেন। শেষ লেখেন ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ১০ই জ্যৈষ্ঠ। তারপর পুজোসংখ্যার লেখায় তিনি হাত দেন। সেই লেখা চলাকালীনই তাঁকে চিরবিদায় নিতে হয়।' একজন বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর হৃদয়-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই 'মৌন মাধুরী' উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। অর্থাৎ বলা যায়, আইনগত দিক দিয়ে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছেদ তথা পরিসমাপ্তি ঘটলেও সেই সম্পর্ককে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনের নানাবিধ অনুভূতিগুলি সম্পৃক্ত থাকে। কাজেই সম্পর্কে হয়তো অন্য রূপ নেয় কিন্তু কখনোই তা শেষ হয়ে যায় না। সেই সূত্রেই এখানেও একটি দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ ছিল বা এখনও আছে। তা কাহিনীর কেন্দ্রিয় নারীচরিত্রের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের

পূর্বে এই সম্পর্কের স্বরূপ কেমন ছিল তা দেখে নেওয়া যাক। যেহেতু স্ত্রী স্বাতীর আত্মচিন্তনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন আভাসিত হয়েছে, এক্ষেত্রে স্বামী দীপকের কোন ভাবনা কিংবা মতাদর্শ এখানে পাওয়া যায় না, সেহেতু বলতে হয়, এই সম্পর্কের প্রকৃতি পরোক্ষভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, জন্মের পর থেকেই জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আর এই যাত্রাপথেই নানা সম্পর্কের জন্ম হয়। একটি সম্পর্ক হয়তো সারাজীবন লিখিতভাবে বয়ে চলে না। একটি জায়গায় এসে থামতে হয়। তবে সেই সম্পর্ক থেমে গেলেও বা ভিন্ন পথে বাঁক নিলেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুভূতিগুলি থেকেই যায়। আবার বলা যায়, যেখানে এসে এই সম্পর্কের স্রোতধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায় সেখান থেকেই আর একটি সম্পর্ক-ধারা জন্ম নেয়। এইভাবেই বিভিন্ন সম্পর্কে আবিষ্ট হয়ে একটি জীবন তার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে। তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু সম্পর্ককে সমাজ স্বীকৃতি দেয় বা 'বৈধ' বলে পরিচিত, এবং অনেক সম্পর্ক আছে যেগুলিকে সমাজ অনুমোদিত করে না সেগুলি 'অবৈধ' তথা 'পরকীয়া' সম্পর্ক নামে পরিচিত।

'দাম্পত্য সম্পর্ক' একটি সমাজ স্বীকৃত সম্পর্ক। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় – স্বাতী ও দীপক পরস্পরকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। বহুচারিতা, বহুগামিতা দীপকের মজ্জাগত হলেও সদালাপী, সুদর্শন, পড়াশোনায় ভালো, ডিবেটে পারদর্শী, কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনায় যোগ্যতর প্রমাণ দেওয়া এই যুবকটির সঙ্গে কলেজের সেই দিনগুলিতে অনেক মেয়েরাই যেখানে বন্ধুত্ব করে গর্ব বোধ করত, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বাতীও তার রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়েছিল। স্বাতী ভেবেছিল বিয়ের পর সে তার ভালোবাসা দিয়ে দীপকের এই উঞ্ছবৃত্তি তথা বদ-অভ্যাস দূরীভূত করতে সক্ষম হবে। তবে ঘটনাক্রমে এ কাজে সে ব্যর্থ হয়। একেবারে বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত স্বাতী যদিও দীপকের অনেক মেয়ে বন্ধুকেই সহ্য করেছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ শিখাকে দীপক যখন স্বাতীরই ঘরে নিয়ে আসে তখন স্বাতীর সহ্যের বাঁধ ভাঙে। একজন স্ত্রীর পক্ষে তা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারণ কোন নারীর পক্ষেই স্বামীর এই ব্যাভিচার সহ্য করা সম্ভব নয়। স্বাতীও ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায় এর প্রতিবাদ করায় দীপক তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। তা ছিল স্বাতীর কাছে আরও অপমানজনক বিষয়। তবু এত ঘটনার পরেও স্বাতী দীপকের কাছে কান্নাকাটি করেছে, তার হাতে-পায়ে ধরে সাধাসাধি করে স্বাতী নিজের অপরাধের কথা জানতে চেয়েছে। এর উত্তরে দীপক জানিয়েছে –"তোমার কোনও দোষ নেই স্বাতী। দোষ আমার স্বভাবের। কাউকে দীর্ঘকাল একটানা ভালোবাসার ক্ষমতা আমার নেই।"[১০০] এক্ষেত্রে বলা যায়

– তাদের সম্পর্কে ভালোবাসা ছিল একপাক্ষিক। দীপকের দিক থেকে স্বাতীর প্রতি হয়তো মোহ-ই ছিল, হৃদয় রসের উৎসরণ তার ঘটেনি। সুতরাং দেখা যায়, এই স্তরে এসে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে। স্বাতী বাধ্য হয়েই আইনের পথ নেয়। তবে সেক্ষেত্রেও দীপক নিজের বিপক্ষে সমস্ত প্রমাণ স্বাতীর হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ সে নিজেও এই সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ একটি 'বৈধ সম্পর্ক' একটি 'পরকীয়া সম্পর্কের' প্রভাবে গভীরভাবে সংক্রামিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত আইনগত দিক থেকে সেটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তবে স্বাতী দীপককেই ভালোবেসেছিল। তাই সে হৃদয় যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তারই বশবর্তীতে স্বামীর প্রতি কখনো তীব্র ক্ষোভ, কখনো গভীর অভিমান কখনো বা বিদ্বেষ যেমন বর্ষিত হয়েছে তেমন তাদের সুখের স্মৃতিও তার মনকে ব্যাকুল করে তুলেছে। আর স্বাতীর মনের এই বিচিত্র ভাবের প্রভাব পড়েছে তার একমাত্র মূক-বধির সন্তান স্বপনের উপর। কেননা, সে প্রতারক দীপকেরই স্মৃতি চিহ্ন। কাজেই স্বপনের প্রতি একদিকে যেমন চরম বিতৃষ্ণায় স্বাতীর মন তিক্ত হয়ে উঠেছে, তেমন পরক্ষণেই তার হৃদয়ে মাতৃস্নেহও জাগ্রত হয়েছে। ফলে একটি দ্বন্দ্ব যে সবসময়-ই তার মধ্যে কাজ করে চলছিল তা বলা বাহুল্য। জীবনের এমন একটি পর্বে এসে মূক ও বধির যুবক শুভেন্দুর সঙ্গে স্বাতীর পরিচয় ঘটে।

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, স্বাতী তার ব্যক্তিগত জীবন এবং এমন এক প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ছিল। কাহিনীর ধারাবাহিকতায় উঠে আসে – স্বপনকে একটি স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়েই শুভেন্দুর সঙ্গে স্বাতীর পরিচয় হয়। সুদর্শন এই যুবকটি একজন চিত্রশিল্পী। তার আচার-ব্যবহারও অনেক বেশি আন্তরিক। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, প্রথমত – স্বাতী তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। স্বপনের কাছ থেকে তার তেমন কিছু আশা না করাটাই স্বাভাবিক ছিল। এরকম ভাবনা থেকে সে যখন প্রথম মূক শিল্পী শুভেন্দুকে দেখে তখন হয়তো স্বাতী খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছিল। হয়তো মনের কোণে ছেলেকে নিয়ে তার খানিকটা আশা জমে উঠেছিল, পাশাপাশি শুভেন্দুর প্রতি তার সহানুভূতিও জাগ্রত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত – শুভেন্দু রূপের সঙ্গে সঙ্গে গুণের অধিকারী ছিল যা স্বাতীকে মুগ্ধ করেছিল। তৃতীয়ত – লক্ষ করা যায়, অস্পষ্ট ভাষায় ও ইশারা ইঙ্গিতে বাক্‌শক্তিহীন এক যুবক অর্থাৎ শুভেন্দু প্রকাশ ক্ষমতায় আরও অপটু এক বালক স্বপনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলেছে দেখে স্বাতীর খুব ভালো লেগেছিল। এক্ষেত্রে স্বাতীর ভাবনা ছিল – এই মূক অসহায় ছেলেটিকে (স্বপনকে) যে ভালোবাসে সেই তার কাছে প্রিয়। কাজেই বলা যায়, এই পরপর কয়েকটি ভাবনার নিরিখেই স্বাতী শুভেন্দু ও তার

পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অপরদিকে স্বাতী একমাত্র সন্তান হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকে। স্বাতীর জীবনযন্ত্রণা যে তার বাবা-মাকেও পীড়িত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘ মানসিক অশান্তিতে তারাও ক্লান্ত হয়ে ওঠেন। তাদের সেই গতানুগতিক জীবন যেন শুভেন্দুর উপস্থিতিতে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। লক্ষ করা যায় – স্বাতীর বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেন্দু নিজের আঁকা একখানি হর-গৌরীর মূর্তি উপহার দেয়। শুধু তাই নয়, স্বাতীদের গোটা বাড়িটা শুভেন্দু তার নিজের মনের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। সেখানে স্বাতীর ঘরখানাও ছিল।

অপরদিকে স্বাতীর বাবা দেবতোষ বাবু তিনি তার অবসর জীবনে শুভেন্দুর মত একজন দাবা খেলার সঙ্গী পেয়েও ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। মনের ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করতে অসমর্থ হলেও অন্তরজগতের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, ভালোলাগা, চাওয়া-পাওয়াকে শুভেন্দু আকার-ইঙ্গিতে ও তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করত। তাই তার ব্যবহারে যে সহজ, সারল্য ও সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যেত নিঃসন্দেহে তা আন্তরিক ছিল। যা স্বাতীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। ফলে শুভেন্দুর প্রতি স্বাতীর সহানুভূতি আরও গভীরতা লাভ করে। এ বিষয়ে স্বাতীর মনোভাব এইভাবে উঠে এসেছে – "শুভেন্দুর জন্য সহানুভূতি বোধ করে স্বাতী। দেখতে অত সুপুরুষ। ছবি-টবিও মোটামুটি মন্দ আঁকে না। কিন্তু বোবা আর গরিব বলে সমাজে কোনও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না, বাক্যও নেই, অর্থও নেই।"[১০১] অর্থাৎ সহানুভূতি হলেও খানিকটা ভাবনা জায়গা করে নিয়েছিল। এ বিষয়ে বলা যায়, স্বাতীয় জীবনে এমন বিপর্যয় নেমে আসার পর সে হয়তো কোনও বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি বা চায়নি। ফলে যন্ত্রণাকাতর এই বৈচিত্রহীন জীবনে তার কাছে ক্রমশ দুঃষহ হয়ে উঠেছিল। এমত পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর উপস্থিতি তার জীবনকে ভিন্ন মাত্রা দান করে। লক্ষ করা যায়, নোট বুকে লিখে লিখে শুভেন্দুর সঙ্গে পরিচয়ের পরিধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে স্বাতী এক নতুনত্বের স্বাদ পায়, সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই অনুভূতি ধরা পড়েছে এইভাবে – "নোট বুকে লিখে লিখে কথা বলার মধ্যে স্বাতী বেশ একটু মজা পেল। হারানো ওই সাধু ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও যেন এক নতুনত্বের স্বাদ পেল। গয়নার পুরনো প্যাটার্ন যেমন চোখে নতুন লাগে, একালের ছেলেমেয়েদের পৌরাণিক নাম যেমন কানে নতুন শোনায়, তেমনি শুভেন্দুর সাধুভাষার ব্যবহারও বেশ একটু অভিনব লাগল স্বাতীর কাছে।"[১০২] বহুদিন ধরে বঞ্চিত থাকা স্বাতীর কাছে শুভেন্দুর শরীরের স্পর্শ এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। তা যেন স্বাতীর তৃষিত শরীর ও মনকে সিক্ত করে তোলে। এইভাবেই

পারিবারিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের আবহে স্বাতী ও শুভেন্দুর মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে ওঠে সামাজিক পরিভাষায় তা 'অবৈধ' সম্পর্ক নামে পরিচিত। তবে জীবনের দাবী সমাজের এই বৈধতা-অবৈধতাকে মেনে চলে না। মনের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক আপন খেয়ালেই গড়ে ওঠে।

দেখা যায়, জীবনের এরকম একটি অবস্থানে শুভেন্দুর অফিসেই স্বাতীর একটি চাকরির ব্যবস্থা হয়। এই চাকরিটির খোঁজ শুভেন্দুই এনেছিল, শুধু তাই নয়, সে এ বিষয়ে অফিসের প্রধানের কাছে সুপারিশও করেছিল। আসলে এই চাকরিটি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাতী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পাশাপাশি তার একাকীত্ব দূর করতে চেয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, জীবনের একটি পর্যায় অতিক্রম করে আসার পর নিজের পরিবার, শুভেন্দু ও তার পরিবার – এই ছিল স্বাতীর চেনা জগৎ। তবে চাকরিসূত্রে সেই জগতের সীমা বিস্তৃত হয়। সেখানে বিভিন্ন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বাতী অনুভব করে যে তার সমাদর এখনো পুরোপুরি বজায় আছে। অর্থাৎ সে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, যা থেকে তার মনে অহংবোধ জেগে ওঠে। কেবল নিজের সম্পর্কে নয়, স্বাতী জানতে পারে – অফিসে শুভেন্দুর 'পজিশন' ভালো নয়। এতদিন ধরে কাজ করছে কিন্তু এখনও তেমন উন্নতি করতে পারেনি। চারজনের মধ্যে ওর স্থান তৃতীয়। বোবা বলে ম্যানেজমেন্ট ওর প্রতি কিছু সহানুভূতিশীল। তাই ও এখনও অফিসে আছে। নইলে ওর অনেক দোষ। অমনোযোগী, অফিসের নিয়ম কানুন মেনে চলে না। ও শুধু বোবা নয়, জড়বুদ্ধিরও অধিকারী। কাজেই এই বিষয়গুলি জানার পর শুভেন্দুর প্রতি স্বাতীর সহানুভূতির জায়গাটি হারিয়ে যায়। তার সঙ্গে শুভেন্দুর যে পরিচয় আছে তা যেন স্বীকার করতে স্বাতীর সংকোচ বোধ হয়। এই বোবা যুবকটিই তার একমাত্র সঙ্গী, বাক্‌শক্তি সম্পন্ন কলিগদের কাছে এ ছিল স্বাতীর অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অর্থাৎ যোগত্যাহীন এই মূক বধির পুরুষটি ধীরে ধীরে স্বাতীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। ইশারা ইঙ্গিতে বা ডট পেন্‌সিলে লিখে লিখে কথা বলতে এখন সে ক্লান্ত বোধ করে। একদিন যে পুরুষের শরীরের স্পর্শ এক অভিনব স্বাদের সন্ধান দিয়েছিল, সেই স্পর্শ স্বাতীর মনে বর্তমানে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা উদ্রেক করেছে। তার মনের পরিবর্তন ধরা পড়েছে এইভাবে –"বহুদিন ধরে স্পর্শসুখ বঞ্চিত স্বাতীর এই পুরুষ স্পর্শ প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগত। বৃষ্টির ধারার মত এই স্পর্শের ধারা ওর সর্বাঙ্গে যেন প্লাবিত করে দিত। কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে পারল এই স্পর্শ সক্ষম সবল একটি বুদ্ধিমান যুবকের স্পর্শ নয়, এই স্পর্শ ওর দুর্বল পঙ্গু বাক্‌যন্ত্রের অযোগ্য প্রতিভূ মাত্র, সেদিন থেকেই ওর মন কেমন সংকুচিত হয়ে রইল। স্পর্শে সেই তীব্র মাদক রস আর নেই। এ যেন কোনও রুগ্‌ন কি পঙ্গুর স্পর্শ, শিশু কি বৃদ্ধের স্পর্শ।

ও যখন চুম্বন করতে আসে স্বাতীর মনে পড়ে যায় ও অঙ্গহীন, বাক্‌শক্তিহীন, ওর বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক স্তরের কিছু নীচে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সুধা পাত্র যেন একটি শূন্যপাত্র হয়ে যায়।"[১০৩] আসলে স্বাতী ও শুভেন্দুর সম্পর্কে ভালোবাসা ছিল একপাক্ষিক। স্বাতী কখনোই শুভেন্দুকে ভালোবাসেনি। সে তাকে বন্ধুর দৃষ্টিতেই দেখেছে। শুভেন্দুর সাহচর্যে স্বাতী তার একাকিত্বকে দূরীভূত করেছিল। সহানুভূতি ও শারীরিক চাহিদা – এই দুইয়ের সংমিশ্রণের প্রভাবে স্বাতী শুভেন্দুর সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে জীবনের এই বর্তমান স্তরে এসে স্বাতীর মনান্ত র ঘটে। শুভেন্দুর প্রতি তার বিতৃষ্ণা জাগে। তাই ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায়, সে যত শুভেন্দুকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে শুভেন্দু তত তাকে আঁকড়ে ধরেছে। ফলে স্বাতীর মনের বিরূপতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর চূড়ান্ত রূপ লক্ষিত হয় – শারীরিক অসুস্থতার কারণে একদিন স্বাতী অফিসে যেতে না পারায় তার অনুপস্থিতিতে শুভেন্দু সকলকে তার ও স্বাতীর বিয়ে করবার কথাটি জানায় এবং এই উপলক্ষে সকলকে সে সন্দেশও খাওয়ায়। এ নিয়ে সকলে ঠাট্টা-তামাশা করলে স্বাতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। শুভেন্দু এখানেই থেমে থাকেনি, অফিস ছুটির পর তার একদল বোবা বন্ধুদেরকে স্বাতীকে দেখায়। তারা যখন স্বাতীর কাছে এসে বিকৃতভাবে 'বৌদি' কথাটি উচ্চারণ করে তখন প্রবল তিক্ততায় স্বাতীর সমস্ত মন ছেয়ে যায়। জীবনের এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত স্বাতী তার বাবার সাহায্য গ্রহণ করে। একজন বাক্‌শক্তি সম্পন্ন মানুষ শুধুমাত্র অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে একজন মূক্ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে – ঐ ঘটনার দিনকয়েক বাদে শুভেন্দু আর অফিসে আসেনি। কারণ সে পদত্যাগ করেছে। তার দু-দিন বাদে ডাকে স্বাতীরই লেখা নোটবুকগুলি শুভেন্দু ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। লক্ষ করা যায় – এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাতী তার বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল যে তিনি শুভেন্দুকে ঠিক কী বলেছিলেন। উত্তরে দেবতোষবাবু অশ্রুসিক্ত নয়নে জানান – শুভেন্দুকে তিনি বলেছেন সে তার ছেলের মত, সে যেন স্বাতীকে শান্তিতে থাকতে দেয়। আসলে দেবতোষবাবু শুভেন্দুকে ভালোবেসেছিলেন। তাই তার মনের কষ্টকে তিনিও অনু ধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শুধু ঐ কথাটাই বলেননি, হয়তো আরও অনেক কথাই বলেছিলেন। শুভেন্দুর প্রতি তার সমবেদনার অশ্রুতেই এর প্রমাণ। যা স্বাতীর দু'চোখেও জল আনে। তার মধ্যেও বিশেষ আবেগঘন এক মুহূর্ত তৈরী হয়। এক্ষেত্রে বলতে হয়, গভীর ভালোবাসা ত্যাগ করবার দীক্ষাও দেয়। ত্যাগের মাধ্যমে শুভেন্দু আসলে তার মৌন ভালোবাসারই জয়গান

ঘোষিত করে গিয়েছে। তার জন্য বাক্‌শক্তির প্রয়োজন হয়নি। কেননা, ভালোবাসার ধারা বাহিত হয় শুধুমাত্র হৃদয়তন্ত্রে। শেষপর্বে কেবলমাত্র শুভেন্দুর হৃদয়তন্ত্রই অনুরণিত হয়নি, সেই অনুরণন খানিকটা হয়তো স্বাতীর হৃদয়েও সঞ্চারিত করতে সে সক্ষম হয়েছিল। বোধহয় তারই প্রতিক্রিয়ায় স্বাতীর দুই নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। আর সেই অশ্রুধারার মধ্যেই কোথায় যেন একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত রয়ে যায়।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস হল **'মহানগর'** (১৯৭৪ সাল)। এটি 'অবতরণিকা' গল্পেরই বিস্তৃত রূপ বা বৃহৎ সংস্করণ। নাগরিক সভ্যতায় মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা এখানে উন্মোচিত হয়েছে। কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যবিত্তের সংস্কার বনাম আর্থিক অসঙ্গতীর টানাপোড়েনে দাঁড়িয়ে এক গৃহবধূর চাকরিগ্রহণ একটি দম্পেত্য সম্পর্ককে বিপর্যয়ের কোন্ পর্যায়ে উন্নীত করে, সেই দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে 'চাকরি' যেন এখানে একটি চরিত্র। তা-ই পরিবর্তন করেছে দু'জন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, জীবন ও মানসিকতা। তবে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন, সংস্কার ও অবমননকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানবিক মূল্যবোধ। আর এই জায়গা থেকেই দুটি মানুষ আবার তাদের পুরনো সম্পর্ক ফিরে পায়। বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে মূল কাহিনীর পাশাপাশি অনেক শাখা কাহিনী উপন্যাসে থাকে। তবে এখানে আমাদের মূল লক্ষ, উক্ত দাম্পত্য সম্পর্কেরই রূপ-প্রকৃতি অন্বেষণ। এই বিষয়টিই পরবর্তী অধ্যায়ে 'অবতরণিকা' গল্প অবলম্বনে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

এইভাবেই আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যা আসলে আমাদের এই বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

## উল্লেখপঞ্জি


১। দ্বীপপুঞ্জ, উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ – ১১-১২
২। ঐ, পৃঃ ১৪
৩। ঐ, পৃঃ ১৪
৪। ঐ, পৃঃ ১৬
৫। ঐ, পৃঃ ১২
৬। ঐ, পৃঃ ১৯
৭। ঐ, পৃঃ ৭৫-৭৬
৮। ঐ, পৃঃ ৪৭
৯। ঐ, পৃঃ ৯১
১০। ঐ, পৃঃ ৯৪
১১। ঐ, পৃঃ ৯৮
১২। ঐ, পৃঃ ৯৮
১৩। ঐ, পৃঃ ৯৮

১৪। অক্ষরে অক্ষরে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ:১৩৭-১৩৮
১৫। ঐ, পৃ: ১৪০
১৬। ঐ, পৃ: ১৭৫
১৭। ঐ, পৃ: ১৭৬
১৮। ঐ, পৃ: ১৭৬
১৯। ঐ, পৃ: ১৭৬
২০। দেহমন, উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: – ১০৫
২১। ঐ, পৃ: ১০৫
২২। ঐ, পৃ: ১০৫
২৩। ঐ, পৃ: ১০৬
২৪। ঐ, পৃ: ১০৬
২৫। ঐ, পৃ: ১২২
২৬। ঐ, পৃ: ১৭৩
২৭। ঐ, পৃ: ১৮৮
২৮। ঐ, পৃ: ১৭৮
২৯। ঐ, পৃ: ১৯৫
৩০। ঐ, পৃ: ১৯৫
৩১। ঐ, পৃ: ২০৬
৩২। চেনামহল, উপন্যাস সমগ্র - প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: – ২১৬
৩৩। ঐ, পৃ: ৩৩৩
৩৪। ঐ, পৃ: ৩১৬-৩১৭
৩৫। ঐ, পৃ: ৩২৮
৩৬। গোধূলি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৮৬
৩৭। ঐ, পৃ: ১৮১
৩৮। ঐ, পৃ: ১৮১
৩৯। ঐ, পৃ: ১৮২
৪০। ঐ, পৃ: ১৮৭
৪১। ঐ, পৃ: ১৮৭
৪২। ঐ, পৃ: ১৮৪-১৮৫
৪৩। ঐ, পৃ: ২২৪
৪৪। ঐ, পৃ: ২৫১
৪৫। ঐ, পৃ: ২৫২
৪৬। সঙ্গিনী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৩২৩
৪৭। ঐ, পৃ: ৩২৪
৪৮। ঐ, পৃ: ৩৩২
৪৯। ঐ, পৃ: ৩৪৪
৫০। ঐ, পৃ: ৩৭২
৫১। শুক্লপক্ষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৪২৭
৫২। ঐ, পৃ: ৪২৭
৫৩। ঐ, পৃ: ৪২৭
৫৪। ঐ, পৃ: ৪২৮
৫৫। ঐ, পৃ: ৩৮২-৩৮৩
৫৬। ঐ, পৃ: ৩৮৩
৫৭। ঐ, পৃ: ৪২৩
৫৮। ঐ, পৃ: ৪৫৭

৫৯। কন্যাকুমারী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৬২৩
৬০। ঐ, পৃ: ৬১৮
৬১। ঐ, পৃ: ৬১৮
৬২। ঐ, পৃ: ৬১৯
৬৩। ঐ, পৃ: ৬১৯
৬৪। ঐ, পৃ: ৬২৫
৬৫। ঐ, পৃ: ৬৩১
৬৬। ঐ, পৃ: ৬৩৮
৬৭। জলপ্রপাত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৩১
৬৮। তিন দিন তিন রাত্রি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৫৪৪
৬৯। ঐ, পৃ: ৬৩৮
৭০। ঐ, পৃ: ৫৪২ ও ৫৪৬
৭১। ঐ, পৃ: ৬৩৮
৭২। ঐ, পৃ: ৬৩৮
৭৩। ঐ, পৃ: ৫৬৫
৭৪। ঐ, পৃ: ৫২৬
৭৫। ঐ, পৃ: ৫৪৪
৭৬। ঐ, পৃ: ৫৪২
৭৭। ঐ, পৃ: ৬৭৩
৭৮। পরম্পরা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র -১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৬৮০
৭৯। ঐ, পৃ: ৭৪৩
৮০। ঐ, পৃ: ৭৪৭-৭৪৮
৮১। ঐ, পৃ: ৭৪৮
৮২। ঐ, পৃ: ৭৪৮
৮৩। দ্বৈতসঙ্গীত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী-২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৫৫৮
৮৪। ঐ, পৃ: ৫৫৮
৮৫। ঐ, পৃ: ৫৫৬
৮৬। ঐ, পৃ: ৫৭৬
৮৭। ঐ, পৃ: ৫৭৮
৮৮। ঐ, পৃ: ৫৮০
৮৯। ঐ, পৃ: ৫৮০
৯০। ঐ, পৃ: ৫৮০
৯১। ঐ, পৃ: ৫৮১
৯২। ঐ, পৃ: ৫৮১
৯৩। ঐ, পৃ: ৫৮৩
৯৪। ঐ, পৃ: ৫৮৩
৯৫। ঐ, পৃ: ৫৮৩
৯৬। সূর্যসাক্ষী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী-২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৪৭
৯৭। ঐ, পৃ: ৬৭
৯৮। ঐ, পৃ: ৬৭
৯৯। ঐ, পৃ: ৬৭
১০০। মৌন মাধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী-২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৪৬৪
১০১। ঐ, পৃ: ৪৮২
১০২। ঐ, পৃ: ৪৮৭
১০৩। ঐ, পৃ: ৪৯৩